২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিশেষ বীক্ষণ : গল্পকার নজরুল

To prepare yourself as an Ideal Teacher,
Join our Institutions...

M.R. COLLEGE OF EDUCATION

(B.Ed. & D.El.Ed.)

Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

BIRA, BALISHA, P.S- ASHOKNAGAR, (N) 24 PGS, WB-743234
www.mrctrust.org, Email- mrctrust2012@gmail.com
Phone- (03216)-261082, Mobile- 9933163040

SAHAJPATH

(B.Ed. & D.El.Ed.)

Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

BIRA, BALISHA, P.S- ASHOKNAGAR, (N) 24 PGS, WB-743702
www.sahajpath.org.in, Email- sahajpath2010@gmail.com
Phone- (03216)-260058, Mobile- 9932563040

MOTHER TERESA INSTITUTE
OF EDUCATION & RESEARCH

(B.Ed. & D.El.Ed.)

Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

NADHBHAG, P.O- KAZIPARA, P.S- MADHYAMGRAM, (N) 24 PGS, KOL-125
www.mtier.in, Email- secretary.mother@gmail.com
Mobile- 9051073449

DR. SHAHIDULLAH
INSTITUTE OF EDUCATION.

(B.Ed. & D.El.Ed.)

Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

AMINPUR, P.O- SONDALIA, P.S- SASBAN, (N) 24 PGS, WB-743423
www.dsie.in, Email- secretary.dsie@gmail.com
Mobile- 9051072035

Founder
Dr. Jahidul Sarkar
Mobile- 9734416128 / 7001575522

Al-Ameen Mission

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah, Ph.: 74790 20059
Central Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Ph.: 74790 20076

SUCCESS AT A GLANCE : 2020

Dazzling Record in NEET (UG)

Marks 626 & above Within AIR 9908 — 61	Marks 600 & above Within AIR 20174 — 134	Marks 580 & above Within AIR 30431 — 238
Marks 565 & above Within AIR 39289 — 322	Marks 550 & above Within AIR 49260 — 434	Marks 536 & above Within AIR 59825 — 516

AIR 916 (675)
Jisan Hossain

AIR 1276 (670)
Tanbir Ahmed

AIR 1522 (666)
Md Samim

AIR 1982 (662)
Ayesha Khatun

AIR 2298 (660)
Al Taufeeq

AIR 2817 (656)
Kanen Akhtar

AIR 2947 (655)
Md Tarip Sk

Higher Secondary (12th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBCHSE	Science	2090	909	1928	2072	2089
	Arts	79	43	66	78	79
CBSE	Science	54	8	24	43	54
	Total	2223	960	2018	2193	2222

Appeared 2223	
From Poor & BPL families	605 (27%)
From lower-middle income group	775 (35%)
From middle & upper middle income group	843 (38%)

81 students have occupied their positions within 20 ranks in the H.S. exminations of the Council

2nd 498 (99.6%) Md Talha

7th 493 (98.6%) Shayna Sultana

9th 491 (98.2%) Qaseed Akhtar

9th 491 (98.2%) K Abdul Halim

9th 491 (98.2%) Junaid Ahmmed

Secondary (10th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBBSE	Boys & Girls	1706	461	1211	1557	1668
CBSE	Boys & Girls	71	21	48	64	70
	Total	1777	482	1259	1621	1738

Appeared 1777	
From Poor & BPL families	627 (35%)
From lower-middle income group	680 (38%)
From middle & upper middle income group	470 (27%)

15 students have occupied their positions within 20 ranks in 10th exam.

7th 686 (98%) S Md Tameem

8th 685 (97.9%) Md Tahseszaman

15th 678 (96.7%) Mir Mousumi

16th 677 (96.7%) Sk Atiulla

17th 676 (96.6%) Sk Tafhim

মীর রেজাউল করিম কর্তৃক ৩৮, ডা. সুরেশ সরকার রোড,
পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ : প্রিয়ব্রত ভাণ্ডারী

মাসিক

উজ্জীবন

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর মুখপত্র

ফেব্রুয়ারি ২০২৩
কলকাতা

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

সভাপতি : আমজাদ হোসেন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

কোষাধ্যক্ষ: মীর রেজাউল করিম

উজ্জীবন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

নির্বাহী সম্পাদক : ইনাস উদ্দীন, জাহির আব্বাস

সম্পাদক মণ্ডলী : অনিকেত মহাপাত্র, আজিজুল হক, আবু রাইহান, আমিনুল ইসলাম, তৈমুর খান, পাতাউর জামান, ফারুক আহমেদ, মীজানুর রহমান, মুসা আলি, মুহম্মদ মতিউল্লাহ, শেখ হাফিজুর রহমান, সাজেদুল হক, সুজিতকুমার বিশ্বাস

উপদেষ্টা মণ্ডলী : আলিমুজ্জমান, খাজিম আহমেদ, জাহিরুল হাসান, মিলন দত্ত, মীরাতুন নাহার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, লোকমান হাকিম, সামশুল হক, স্বপন বসু

প্রচ্ছদ : ওয়াসেফুজ্জামান (**নাম-লিপি :** সম্বিত বসু)

বর্ণ সংস্থাপন : বর্ণায়ন

বিনিময় : ৫০ টাকা

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭

ই মেল : ujjibanmag@gmail.com, aliahsanskriti@gmail.com

ই মেল এ লেখা পাঠান অথবা ব্যবহার করুন এই ঠিকানা :

মীর রেজাউল করিম, ৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (তৃতীয় তল), কলকাতা-১৪

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, নিউ লেখা প্রকাশনী, মল্লিক ব্রাদার্স, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

'উজ্জীবন' আলিয়া-র রূপান্তরিত রূপ

সংসদ-সংবাদ

১। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৯৬১ অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছে আমাদের সংস্থা। রেজিস্ট্রেশন নম্বর : S0033754 of 2022-2023 dated 06-02-2023। তবে নিয়ম নীতিগত নানা জটিলতার কারণে আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এই নামে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায়নি; এখন আমাদের অফিসিয়াল নাম 'কলকাতা আলিয়া সাংস্কৃতিক সমিতি'। আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, কলকাতা আলিয়া সাংস্কৃতিক সমিতি হবে আমাদের মাতৃসম সংস্থা। এই সংস্থার অধীনে আমরা একাধিক শাখা সংস্থা তৈরি করবো এবং তা নিজ নিজ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থাকবে। এখন থেকে আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ বিবেচিত হবে কলকাতা আলিয়া সাংস্কৃতিক সমিতি-র অধীনস্থ সংস্থা হিসাবে। কলকাতা আলিয়া সাংস্কৃতিক সমিতি কর্তৃক পরিকল্পিত ও গৃহীত যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের ছত্র-ছায়ায়।

২। জানুয়ারি ২০২৩ এ সংস্থার ব্যবস্থাপনায় দুটি সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছে; যথা—

৭ জানুয়ারি : শহীদুল্লাহ স্মারক বক্তৃতা। সূচক ভাষণ-সাইফুল্লা; বক্তা-মীর রেজাউল করিম, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১৪ জানুয়ারি : স্মরণসভা, কবি জয়নাল আবেদিন

৩। উজ্জীবন, জানুয়ারি ২০২৩ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যার বিশেষ বিষয় 'ঔপন্যাসিক নজরুল'। কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস বিষয়ক চারটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা সংকলিত হয়েছে এখানে। রয়েছে এইসময়ের প্রখ্যাত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মীরাতুন নাহার-এর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। সেখ রফিকুল ইসলামের উপন্যাস 'ঘূনাবর্ত'-র ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয়েছে এই সংখ্যা থেকে। কবিতা, গল্প, সাংস্কৃতিক খবর, বই-কথা প্রভৃতি সহযোগে অলংকৃত করা হয়েছে সংখ্যাটিকে। উল্লেখ্য, অনিবার্য কারণে মে-জুন ২০২২ প্রকাশের পর উজ্জীবন ২০২২ এর আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।

উজ্জীবন : প্রাপ্তিস্থান

- অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ: বুক কর্ণার, ৯৪৭৫৯৫৩৩৪৫
- করিমপুর, নদীয়া: করিমপুর পুস্তক মহল, ৯৭৩৩৮১১৮১৯
- কলকাতা : পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, অপূর্ব, নিউ লেখা, মল্লিক ব্রাদার্স, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
- কৃষ্ণনগর, নদীয়া: বইঘর, ৯৭৩২৫৪১৯৮৪
- চাঁচল, মালদা : পুথিপত্র
- ডোমকল, মুর্শিদাবাদ: রিলেশন (বুকস্টল), ৯৭৩২৬০৯২১০
- দুবরাজপুর, বীরভূম : টিচার্স কর্নার
- বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান : রমজান অ্যাকাডেমী, ৮৭৭৭৩৯৬৬৩২ বিবেকানন্দ বুক অ্যান্ড জেরক্স সেন্টার, ৯৩৭৮১৩২৬৮৭
- বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা : সাহা বুক স্টল, ৯৮৩২৮০৬৬৬৩
- বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ : বিশ্বাস বুক স্টল, ৯৮০০০০০০৪৯ আদর্শ বুক সেন্টার, ৯৪৩৪৩৯৪৪৫২
- বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা : মল্লিক গ্রাফিক্স, ৯১৬৩৪৮৬৭৬৬
- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : অন্নপূর্ণা বুক হাউস, ৯৭৮৩৭৪৪৪৯৮
- বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর : কৃষ্ণ বুক হাউস, ৯৪৩৪৩৯৪২১২
- মালদা সদর, মালদা: আদর্শ পুস্তকালয়, ৯৫৯৩৭০৬০০৭
- মালদা সদর, মালদা: পুনশ্চ, ৯১২৬৫২৩৭৫৪
- মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর : মল্লিক পুস্তক বিপণি, ৯৯৩২০৫৭৬৬৭
- শিলিগুড়ি, দার্জিলিং: ইকনমিক বুক স্টল
- সংগ্রামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ছাত্র সাথী, ৯৫৯৩৪৮২১৬৯
- সিউড়ি, বীরভূম : ভারত পুস্তকালয়

উজ্জীবন-এর স্বজন

- **২৪ পরগনা-উত্তর**
  আমিনুল ইসলাম, বারাসাত, ৯৪৩৩২৩১২০৪
  মশিহুর রহমান, রাজারহাট, ৮০১৭৩৪৩১৫৬
  হাকিমুর রশিদ, হাবড়া, ৯৭৪৮৮৫১১৭৬
- **২৪ পরগনা-দক্ষিণ**
  আব্দুল আজিজ, সংগ্রামপুর, ৮১৪৫৪৪৪১৯৫
  আসাদ আলি, ভাঙ্গড়, ৯১২৩৬৮৯৬১৫
  মুসা আলি, জয়নগর, ৯১৫৩১৩৫৪৬৮
- **কোচবিহার**
  মাহাফুল আলম, দীনহাটা, ৯৫৬৩৩৭৩১১৪
  সুরাইয়া পারভিন, কোচবিহার সদর, ৮৭৬৮২৭৩৯১২
- **জলপাইগুড়ি**
  আরমান সেলিম, ৯০৯৩৮৮৫৫৪৬
- **দিনাজপুর-উত্তর**
  আসফাক আলম, ৭৯৮০৪৩৪৬২৫
- **দিনাজপুর-দক্ষিণ**
  মীরাজুল ইসলাম, ৮৭৭৭৬৮৯৬৫১
- **নদীয়া**
  সাজাহান আলী, কৃষ্ণনগর, ৯৪৩৪২৪৫২৬২
  সুজিত বিশ্বাস, করিমপুর, ৮৯১৮০৮৯৯৬৩
  হরিদাস পাটোয়ারী, রাণাঘাট, ৬২৯৫৮২৭৬৪৫
- **পুরুলিয়া**
  মহম্মদ খুরশিদ আলম, ৯৯৩২২৬৩৩৭৮
- **বর্ধমান-পশ্চিম**
  আমিরুল ইসলাম, দুর্গাপুর, ৯৮৩২৭৪৯২৮৭
  আশরাফুল মণ্ডল, দুর্গাপুর, ৯৪৭৫৯৩৮৩৬৬
- **বর্ধমান-পূর্ব**
  কারিমুল চৌধুরী, বর্ধমান সদর, ৭০০১২৪৪২৮৮
  রমজান আলি, বর্ধমান সদর, ৯৪৩৪০১৪১১৭
  সামসুজ জামান, জামালপুর, ৬২৯০৯৫৬৪৫৪
  সোমা মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান সদর, ৯৫৩১৫৯৮৬৫৩
- **বাঁকুড়া**
  ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ, ৯৪৭৬২৬৮৫৫৪
- **বীরভূম**
  তৈমুর খান, রামপুরহাট, ৯৩৩২৯৯১২৫০
  ফজলুল হক, সিড়ডি, ৮২৪০৯৭৯০৯৩
  মেহের সেখ, লাভপুর, ৮৫০৯১০২১৫৪
- **মালদা**
  আবদুল মালেক, ৯৫৯৩৭০৬০০৭
  জুলফিকার আলি, চাঁচল, ৯৭৩৪১৯২১৭৫
  মহঃ আদিল, মালদা সদর, ৯৭৩৫৯৩৭৯৫০
  মহঃ ইব্রাহিম, মালদা সদর, ৮৯৭২৫১৯৮৭৯
  শাহ নওয়াজ আলম, কালিয়াচক, ৭০০১২৭৪৯১৫
- **মেদিনীপুর-পশ্চিম**
  কামরুজ্জামান, খড়গপুর, ৯৯৩২২১৫০৩৪
  বিমান পাত্র, ঘাটাল, ৯৪৭৬৩২৯৩১২
  সেখ সাব্বির হোসেন, মেদিনীপুর সদর, ৯৬৭৯১৪৮১৭২
- **মেদিনীপুর-পূর্ব**
  আমিনুল ইসলাম, হলদিয়া, ৯০০২৩৭৯৪২৯
  ওয়াহেদ মীর্জা, এগরা, ৯১৬৩৩৮৭৬৬৭
  মোকলেসুর রহমান, কাঁথি, ৭০০৩৫৫৪০০৪
- **মুর্শিদাবাদ**
  আনোয়ারুল হক, বেলডাঙ্গা, ৯৭৩৫৯৪৭৯১১
  আলিমুজ্জমান, বহরমপুর, ৮৬৩৭৫৯৩৭৭২
  মহঃ বদরুদ্দোজা, ডোমকল, ৮০১৬১৬১৭৬৫
- **দার্জিলিং**
  অঙ্কুর মহন্ত, ৯৬৪১২৪২৪১১
- **হাওড়া**
  ইসমাইল দরবেশ, সাঁতরাগাছি, ৭০০৩৪৪৬৬৯৪
  মনিরুল ইসলাম, বাগনান, ৭৯০৮১৮৮০৭১
  সেখ নুরুল হুদা, বাগনান, ৯০৭৩৩১২১৮১
- **হুগলি**
  আনোয়ার সাদাত হালদার, ফুরফুরা শরীফ, ৮৯০২৪০৮৪২০
  মুজিবর রহমান, হরিপাল, ৯৬৩৫৭০৬২২০

আমাদের কথা

উজ্জীবন, জানুয়ারি সংখ্যার বিষয় ছিল ঔপন্যাসিক নজরুল। এবার গল্পকার নজরুলকে বিষয় করা হয়েছে। পরিকল্পনা রয়েছে নাটককার নজরুল ও সম্পাদক নজরুল বিষয়ক আরও দুটি সংখ্যার রূপায়ণ। নজরুলকে নিয়ে আমাদের এই বিশেষ ক্রিয়াশীলতার তাৎপর্য নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা সময় ছিল, যখন নজরুল এপার বাংলায় অচর্চিত প্রায় একটি নামে পরিণত হয়েছিলেন। পরে ধীরে ধীরে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কিন্তু এখনো অধরা।

আমরা বিশ্বাস করি, হাজার বছরের বাঙালি জাতি-সংস্কৃতির ইতিহাসে নজরুলের সঙ্গে তুল্য ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয়টি নেই। তিনি আক্ষরিক অর্থেই বাঙালি জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পিতামহ। হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে নির্মিত যে বাঙালি সমাজ তার ভিতরকার রসায়নকে আত্মস্থ করে জাতীয় জীবনের চরাচর জুড়ে তাকে ছড়িয়ে দেওয়া, পর্যাপ্ত ফসল ফলানোর যে ঐকান্তিক প্রয়াস নজরুলের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়েছিল তা অনন্য। এমন করে আর কেউ ভেবেছেন ও সে ভাবনার চারাগাছ কী ব্যক্তিজীবন, কী জাতীয় জীবন-ক্ষেত্রে রোপন করতে প্রয়াসী হয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

বাঙালি জাতীয় জীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা সাম্প্রদায়িকতা। হাজার বছর পাশাপাশি বসবাস করার পরেও মুসলমান ও হিন্দু এই দুই প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায়ের পারস্পরিক চেনাজানার অভাব ঘোচেনি। অপরিচিতির গাঢ় কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সমাজ-মন। এমন অপ্রীতিকর অবস্থায় দায় কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।তবে তুলনামূলকভাবে মুসলমান সমাজ এক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থন করে একটু বেশি সরব হতে পারেন। তাদের দিক থেকে প্রচেষ্টা ছিল অনেক বেশি। মুসলমান রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু কবিদের হাতে বাংলা সাহিত্যের নিবিড়চর্চা, মুসলমান কবিদের রচনায় ধারাবাহিকভাবে হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির উপস্থাপন (লোরচন্দ্রাণী-সতীময়না, পদ্মাবতী প্রভৃতি); বিশেষ করে মুসলমান কবিদের বৈষ্ণবপদ রচনা তার উজ্জ্বল উদাহরণ। সেদিক থেকে দেখলে, অমুসলিম সমাজের অবস্থান এক্ষেত্রে অস্বস্তিকর। প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্যে অমুসলিম সমাজ-কর্তৃক খোদিত ধর্মীয়-সমন্বয়ের চিহ্ন মোটেই সুস্পষ্ট নয়। আর আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো তার প্রশ্নই ওঠে না। ধর্ম সমন্বয়ের বিপরীতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে লালন করা হয়েছে নিষ্ঠার সঙ্গে। আমাদের বরেণ্য সাহিত্যিকবর্গের মধ্যে কারও কারও অবস্থান এখানে আক্ষরিক অর্থেই দুভার্গ্যজনক। কেউ কেউ আবার সেভাবে নিজেকে প্রকট না করে প্রকারান্তরে এমন এক অবস্থান নিয়েছেন যাতে সাম্প্রদায়িকতার সন্ততিরা প্রশ্রয় পেয়েছে। তাঁদের সমুদ্রবৎ সৃষ্টিক্ষেত্রে বাংলার সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিবিম্বন নেই বললেই চলে। আর এখানেই নজরুলের অনন্যতা।

তিনি শুধু একাধারে ইসলামি সংগীত ও শ্যামাসংগীত রচনা করেননি; তাঁর সৃষ্টিক্ষেত্রের চরাচর জুড়ে একটা সুরই নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে; সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিসরে তাঁর অবস্থান যেমন প্রশ্নাতীত তেমনি প্রশ্নাতীত অবস্থানে উপনীত হয়েছেন সাহিত্যিক নজরুলও। একধারে হিন্দু ও মুসলমান পুরাণ-সংস্কৃতিকে তিনি তাঁর কবিতায় যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা বিস্ময়কর। তাঁর ভাষাবোধ বা ভাষিক অবস্থান আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এক বলিষ্ঠ জমীনের উপর। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতোই সেমেটিক ভাষারও নানা উপাদান মিশে রয়েছে আমাদের জীবন-সংস্কৃতিতে; এই প্রত্যক্ষ বাস্তবকে শিরোধার্য করে তার সাপেক্ষে বাংলা ভাষা-সংস্কৃতিকে নির্মাণ করার যে প্রত্যয়ী অবস্থান নজরুলের মধ্যে লক্ষ করা গেছিল তা আজও আমাদের কাছে আদর্শস্থানীয়।

সাতচল্লিশের বঙ্গভঙ্গের রক্তাক্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আমাদের কারোরই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। এদিকে এমন অপ্রীতিকর অবস্থার পক্ষে অবস্থান দিচ্ছেন অনেক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব; বাঙালিকে আরও, আরও বেশি করে ভাঙতে চাইছেন তাঁরা। তাঁদের এমন নষ্ট-মানসিকতার বিপরীতে প্রতিবাদের মশাল জ্বালিয়ে রাখার জন্য নজরুল, হ্যাঁ নজরুলই হতে পারেন পরম আশ্রয়।

কবি সেখ নুরুল হুদা-র মন ও মননের অসামান্য উদ্ভাসন

সংখ্যা-সূচি

পাঠক-দর্পণ

পল্লবী রায় ৯

বীক্ষণ: গল্পকার নজরুল

নজরুল ইসলামের ছোট গল্প—লায়েক আলি খান ১১

গল্পকার নজরুল ইসলাম—মহম্মদ ইব্রাহিম ১৯

প্রসঙ্গ : নজরুলের শিউলি মালা—সাইফুল্লা ২৭

নজরুলের গল্প : সমাজ-সংস্কৃতি—মিরাজুল ইসলাম ৩৭

কবিতা : সা'আদুল ইসলাম ৪৩, ফাহিম হাসান ৪৪, বিমান পাত্র ৪৫, সাঈদ আনোয়ার ৪৫

ধারাবাহিক উপন্যাস : ঘূর্ণাবর্ত—সেখ রফিকুল ইসলাম ৪৬

গল্প

রাতের সঙ্গী—মুসা আলি ৫১

নিজস্ব পুরণে—কামাল হোসেন ৫৭

বঙ্গদর্পণ : বেঁধে বেঁধে থাকার সেই সব দিন—আব্দুল বারী ৬২

বই-চর্চা: বাঙালি ও বাঙালি মুসলমান—ইনাস উদ্দীন ৭১

নিবেদন

১। বার্ষিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা দিয়ে মাসিক 'উজ্জীবন' এর গ্রাহক হন। এ বিষয়ে আপনার নিকটবর্তী প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

২। আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের যাবতীয় প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য বার্ষিক ১০০০/- (এক হাজার) টাকার বিনিময়ে সার্বিক প্রকাশনা গ্রাহক হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। এই অর্থ এমনিতে অনুদানমূলক সহায়তা হিসেবে বিবেচিত হবে; পাশাপাশি এর সাপেক্ষে সংসদ প্রকাশিত 'উজ্জীবন' পত্রিকা সহ যাবতীয় পুস্তক উপহার হিসেবে আপনার হাতে তুলে দেওয়া হবে; যার অর্থমূল্য হবে এক হাজার বা ততোধিক টাকা।

৩। আমাদের এই পথচলায় আপনাকে সহযাত্রী ও সহকর্মী হিসাবে পেতে চাই । অনুরোধ থাকছে, সাধারণ অনুদানের পাশাপাশি বৃহত্তর লক্ষ্য রূপায়ণের লক্ষ্যে, বিশেষত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের সাপেক্ষে আপনার দেয় যাকাতের অংশবিশেষ প্রদান করুন।

লেনদেন

A/C 31590592615
1FSC SBIN0001299
PHONEPE 7872422313
GPAY 9734662218
হোয়াটস্‌অ্যাপে (৮৬৩৭০৮৬৪৬৯) স্ক্রিন শট পাঠানোর অনুরোধ করছি
যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭, ৯৪৩২৮৮০২৪২
aliahsanskriti@gmail.com

বাঙালি মুসলমান লেখিকা ৭৫০
চিত্ররেখা গুপ্ত
সাহিত্য সংসদ
(অনন্য গবেষণা গ্রন্থ। সামাজিক মূল্যের সাপেক্ষেও অবিস্মরণীয়।)

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশনা
সোহরাওয়ার্দী পরিবার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার—আলিমুজ্জমান
নেপথ্য-নায়ক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন—খন্দকার মাহমুদুল হাসান (জীবনীমালা-১)
মৌলবি মুজিবর রহমান ও 'দ্য মুসলমান'—মিলন দত্ত (জীবনীমালা-২)
ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ও বাংলার নবজাগরণ—সামশুল আলম (জীবনীমালা-৩)
নূরন্নেছা খাতুন রচনা সমগ্র—মীর রেজাউল করিম (প্রকাশিতব্য)
চরিতাভিধান বাংলার মুসলমান সমাজ—সম্পাদকমণ্ডলী (প্রকাশিতব্য)

প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে
বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্যচর্চা
সম্পাদনা : সাইফুল্লা ও কামরুল হাসান
১-৪ খণ্ড, ২৫০০/-
বুকস স্পেস
২বি/৩, নবীন কুণ্ডু লেন ● কলকাতা-৯
● যোগাযোগ : ৯১৪৩১৩৪৯৯৩

পাঠক-দর্পণ

মাননীয় সম্পাদক
উজ্জীবন

আকস্মিকভাবেই হাতে এসেছিল 'উজ্জীবন' মাসিকপত্রের জানুয়ারি ২০২৩ সংখ্যাটি। প্রচ্ছদে কাজী নজরুল ইসলামের তিনটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা দেখে প্রাথমিক একটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পাতা উল্টে পুরোটা দেখার পরে পত্রিকাটির অভিনবত্বের প্রতি বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি হল। সেই ভালো লাগার কথাগুলো তুলে ধরার জন্য এই পত্রের অবতারণা।

ঘোষণা অনুসারে এই বঙ্গে বর্তমান মুসলিম শিক্ষিত সমাজে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করাই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। একথা তো সত্য, যে স্বাধীনতা পূর্বকালে 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি সাময়িকপত্র বাংলার মুসলমান সমাজে সাহিত্য সংস্কৃতি-চর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। দেশভাগের পর স্বাভাবিক ভাবেই সে ধারা স্থিমিত হয়ে আসে। 'জাগরণ', 'পয়গাম', 'কাফেলা' প্রভৃতি কিছু কিছু পত্রিকা বেশ কিছুদিন এই ধারাকে বজায় রাখার সীমিত প্রচেষ্টা নিয়েছিল, কিন্তু কালের প্রবাহে একসময় হারিয়ে যায় সেসব। এখন এপার বাংলায় মুসলমান সমাজ কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিচালিত মননশীল কোনো সাহিত্যপত্র নেই সেই অর্থে। অথচ বিগত ২০-২৫ বছরে এই বঙ্গে একটা শিক্ষিত মুসলিম জনসমাজ গড়ে উঠেছে। তাদের ভিতরে এই অভাব বোধ নিশ্চয় কাজ করে। 'উজ্জীবন'কে দেখে মনে হল — এই পত্রিকা সেই অভাব পূরণ করার একটা মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু পাতা উল্টে পুরোটা দেখার পরে পত্রিকাটির অভিনবত্বের প্রতি একটা বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি হলো। সেই ভালো লাগার কথাগুলো তুলে ধরার জন্য এই পত্রের অবতারণা।

আগেই বলেছি, তিনটি নজরুল-উপন্যাসের পর্যালোচনা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল—সেগুলি নিয়ে কয়েকটি কথা উল্লেখ করি। 'কুহেলিকা' উপন্যাস নিয়ে আলোচনায় সুমিতা চক্রবর্তী দেখিয়েছেন উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীরের জীবনে বিপ্লবী মতাদর্শ ও প্রেম কীভাবে সমান্তরালে বয়ে চলেছে এবং শেষে কোথাও গিয়ে প্রেম ও দেশপ্রেম এক হয়ে গিয়েছে। জাহাঙ্গীরের চরিত্রটি যে নজরুল জীবনেরই প্রতিচ্ছবি তা এই কাহিনিতে সুস্পষ্টভাবেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে কাহিনির গঠন ও প্লট নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক অসংগতি আছে, কিংবা উপন্যাসটি শিল্প-সৃষ্টির বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারাকে অনুসরণ করেনি — এই অভিযোগে অনেকে 'কুহেলিকা'-কে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু প্রাবন্ধিক স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যে সাহিত্য বা শিল্প কখনোই তত্ত্বকে অনুসরণ করে চলে না, বরং সাহিত্যের মুখ চেয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব নির্মিত হয়েছে। তাই পাঠকের মনে এক একটা সাহিত্যের এক একরকম উপলব্ধি প্রতিবিম্বিত হয়। এটিএম সাহাদাতুল্লা নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার সাথে প্লেটোনিক প্রেমের তাত্ত্বিক ভাবনার রসায়ন। উপন্যাসটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কীভাবে দরিদ্র মানুষের ক্ষুধার লেলিহান শিখা ধ্বংস করে দেয় তার পারিবারিক জীবন, তার সামাজিক জীবনকে। শেখ জাহির আব্বাস 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের আড়ালে আত্মঘোষণা' নিবন্ধে দেখিয়েছেন, এটি মূলত ব্যক্তি নজরুলেরই আত্ম-ঘোষণা। ১৭টি পত্র সমন্বিত এই উপন্যাসের বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে প্রাবন্ধিক অঙ্কন করেছেন এক আত্মজীবনের প্রতিকৃতি, যেখানে বিদ্রোহী কবি নিজেকেই চিত্রায়িত করেছেন বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে।

প্রবন্ধ ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়। 'পাকা তেলাকুচো ফলের মতো অমলিন সূর্যের লাল আলো' কিংবা 'মায়ের মায়ার মতো ঝরে পড়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন শিশুর মুখের মতোন পৃথিবীর বুকে' ---মহম্মদ বাকীবিল্লাহ মন্ডলের কবিতায় এই উপমা সৃষ্টি করেছে এক অন্য রকম কাব্যময় আবহ। জুলফিকার খান, সাহারুখ মোল্লা, আতিয়ার রহমান, ফিরোজা খাতুন, মুসলিমা বেগমের কবিতাগুলিও যথেষ্ট সুখপাঠ্য। বর্তমান সময়ের অভিশপ্ত অন্ধকার ও বিষাক্ত পরিবেশের ছবি যেমন উঠে এসেছে এই কবিতাগুলিতে, তেমনি ফুটে উঠেছে আশার আলো (হিমভরা পৃথিবী, জুলফিকার খান)।

দুটি নিটোল সাবলীল ও সুন্দর ছোটগল্প পত্রিকাটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। সাম্প্রতিক কালে ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে

যে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপটে রচিত শেখ আব্দুল মান্নানের 'মনের আকাশে আলো' গল্পে উঠে এসেছে এক টুকরো সুন্দর সম্প্রীতির ছবি। দুই বাংলার দুই ভিন্ন ধর্মের কিশোর-কিশোরী ও তাদের পরিবারের লোকজনের মধ্যে টানাপোড়েন, সম্পর্কের জটিলতা—সব শেষে পরিণতি লাভ করেছে এক আবেগময় মানবিক প্রত্যয়ে। ওপার বাংলার অনুপ্রবেশ এবং সম্প্রদায়ের বিভেদকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক কান্ডারীদের সওদাগরী মনের মুখে লেখক চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছেন।

এই পত্রিকার আরেকটি মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে বিদুষী মীরাতুন নাহারের সাক্ষাৎকার। অসম্ভব শান্ত, মৃদুভাষী এই বিশিষ্ট গুণী মহিলার অনেক আলোচনা আমরা টিভিতে দেখেছি। বর্তমানে মেয়েদের স্বাধিকার অর্জন, উগ্র সম্প্রদায়িকতা, মুসলিম সমাজ জীবনের নানাবিধ সমস্যা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে তার স্পষ্ট অথচ যুক্তিসিদ্ধ বক্তব্য আমরা শুনে থাকি। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবন এবং সামাজিক জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু আমরা জানতে পারলাম। প্রাসঙ্গিক কিছু সাংস্কৃতিক খবরাখবর পত্রিকার প্রাসঙ্গিকতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

এই পত্রিকার আরেকটি মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে বিদুষী মীরাতুন নাহারের সাক্ষাৎকার। অসম্ভব শান্ত, মৃদুভাষী এই বিশিষ্ট গুণী মহিলার অনেক আলোচনা আমরা টিভিতে দেখেছি। বর্তমানে মেয়েদের স্বাধিকার অর্জন, উগ্র সম্প্রদায়িকতা, মুসলিম সমাজ জীবনের নানাবিধ সমস্যা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে তার স্পষ্ট অথচ যুক্তিসিদ্ধ বক্তব্য আমরা শুনে থাকি। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তার ব্যক্তিজীবন কর্মজীবন এবং সামাজিক জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু আমরা জানতে পারলাম।

সৈয়দ রেজাউল করিম তাঁর 'স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান' গল্পটি সাধারণ একটি প্রেম কাহিনি দিয়ে শুরু করলেও কাহিনি যত অগ্রসর হয়েছে ততই গল্পের রহস্যময়তা ঘনীভূত রূপ নিয়েছে। এ গল্প পাঠককে বাধ্য করে গল্প-পথ অনুসরণ করে উপসংহারে উপনীত হতে।

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতার পাশাপাশি আরো কিছু বিষয়ের সন্নিবেশ পত্রিকাটির আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলেছে। 'মুর্শিদাবাদ: আম দরবারে নবাব' —এ তথ্যমূলক আম-কাহিনি তুলে ধরেছেন মাজরুল ইসলাম। 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' শীর্ষক বহু বিতর্কিত ও বহু চর্চিত লেখাটিতে বর্তমান শাসকবর্গের এই প্রসঙ্গে অতি উৎসাহের পিছনে এক কালো মেঘের অশনি সংকেত দেখতে পেয়েছেন পত্রিকার সম্পাদক। ভারতের মতো বহু ধর্ম সম্প্রদায়, জাতি ও বহু ভাষাভাষীর দেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকাটাই স্বাভাবিক। আর এই বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের-উত্তাপ হলো ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণধারা। তাঁর মতে মুসলমান সমাজ তথা যে কোনো সংখ্যালঘু সমাজের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তাদের নিজস্বতাকে বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

কিন্তু যে জায়গাটিতে এসে হোঁচট খেলাম সেটি হল এই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি উপন্যাস। পঞ্চাশ বছর পরে দুই বন্ধুর মধ্যে আকস্মিক অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় উঠে আসা অবুঝ ছেলেবেলা, বয়স সন্ধিক্ষণের চপলতা, প্রথম সিগারেট খাওয়া, প্রথম যৌবনের রোমান্টিক সময় খুব সুন্দর ভাবেই ছায়াপাত করেছে 'ঘূর্ণাবর্ত' শীর্ষক এই উপন্যাসটিতে। কিন্তু মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ একান্ত ব্যক্তিগত এমন আলাপচারিতাকে কি আদৌ উপন্যাস বলা যায়? দৈর্ঘ্য দিয়ে সাহিত্যের বিচার করা যায় না ঠিকই, কিন্তু উপন্যাস বলতে আমরা যা সাধারণত প্রত্যাশা করে থাকি —তার কোনোটিই যেন এই লেখায় সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। অবশ্য একটি সুন্দর ছোট গল্প হিসেবে অবশ্যই রচনাটিকে পাঠ করা যায়।

যাইহোক, সবমিলিয়ে এই পত্রিকা এক সমান্তরাল জাগরণের প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছে। আগ্রহ নিয়ে পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় রইলাম।

পল্লবী রায়
লেক গার্ডেনস, কলকাতা

নজরুল ইসলামের ছোট গল্প

লায়েক আলি খান

ঔপন্যাসিক নজরুল এর আবির্ভাব কল্লোলের কোলাহলের মধ্যে হলেও গল্পকার হিসেবে তিনি প্রাক্ কল্লোল পর্বেই আবির্ভূত। প্রথম জীবনের সাহিত্যচর্চার কথা বাদ দিলে এ কথা বলতে হয়, যে নজরুলের যথার্থ সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছে তাঁর সৈন্যবাহিনীতে অবস্থান কালে।

রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব শুরু হল, (১৯১৭) নজরুল প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন না। সৈন্য বিভাগে যোগ দিলেন। দেশের পরাধীনতা ছাত্র জীবন থেকে নজরুলকে পীড়িত করছিল। সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের পেছনে ছিল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণের ভাবনা।—এ রকম সংবাদ তাঁর সহপাঠী (সতীর্থ নয়) শৈলজার। মুজফফর আহমেদও একথা বলেছেন।

কিন্তু দেশকে স্বাধীন করা, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধশিক্ষা ইত্যাদির ভেতরের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন সৈন্যবাহিনীতে নজরুলকে যেতে হয়েছিল অন্ন সংস্থানের জন্য। চাকরি করতে। আর বঙ্গদেশের তথা কলকাতার মাটিতে চাকরির অনুসন্ধান না করে, স্কুলের শেষ পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি নিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যাওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই এক রোমান্টিক মন ক্রিয়াশীল হয়েছিল। এক প্রেম-প্রত্যাখ্যাত বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা। এ প্রেমের নায়িকা অবশ্যই সেই প্রেমিকা যার মাথার কাঁটা সৈন্যবাহিনীতে যাবার সময় নজরুলের সঙ্গে ছিল। এই নারীই হয়তো নজরুলের জীবনের প্রথম প্রেমিকা। এই নারীর কথা নজরুলের সৈন্যবাহিনী-সহকর্মী প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় জানালেও তার নাম প্রকাশের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে নীরব থেকেছেন। এই মানসিক যন্ত্রণাই রোমান্টিক নজরুলকে লেখনী ধারণে প্রেরণা দিয়েছিল বলে মনে হয়। একথার প্রমাণ বহন করে তাঁর প্রথম জীবনের লেখা গল্প ও পরবর্তীতে লেখা উপন্যাস, কবিতা এবং গান। তাঁর 'বাঁধন-হারা' পত্র উপন্যাসের নায়ক সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে ঠিক এই প্রেম-প্রহত মানসিকতা থেকে। আশ্চর্যজনকভাবে তার নাম নুরুল হোদা। ডাক নাম নুরু। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, নজরুলও নিজের নুরু নাম পছন্দ করতেন। নজরুলকে যাঁরা ভালোবাসতেন ও স্নেহ করতেন তাঁরা নজরুলের নুরু নাম ব্যবহার করতেন। বিভিন্ন চিঠিতেও নজরুল নুরুদা, নুরু স্বাক্ষর করেছেন। সৈন্য বাহিনীতে থাকা কালে নজরুলের লেখা বিভিন্ন গল্পের নায়কেরাও ব্যথাহত ও সৈন্যবাহিনীতে যোগদানকারী। এই মানসিক অবস্থাতে সৈন্যবাহিনীর কঠোর জীবন থেকেও ব্যথার দানে-র রোমান্টিক প্রেম-কথা রচনা সম্ভবপর।

অবিশ্বাস্য হলেও কবি নজরুল সম্পর্কে আরো একটি কথা মনে হয় সত্য। সাহিত্য জীবনে নজরুল প্রথমে গল্পকার, তথা গদ্যকার, পরে কবি। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা গল্প 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' (১৯১৯)। আর তাঁর প্রথম পর্যায়ের রচনা প্রকাশের তালিকার দিকে নজর দিলে বোঝা যাবে নজরুলের সাহিত্যচর্চার প্রাথমিক প্রকাশটা ছিল গদ্য তথা গল্পকারের, এখানে সেই তালিকাটি উদ্ধার করা যেতে পারে :

রচনাকাল—পত্রিকা—রচনা—শ্রেণি

১৯১৯/১৩২৬—জ্যৈষ্ঠ—সওগাত—বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী—গল্প

১৯১৯/১৩২৬---শ্রাবণ---বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা—মুক্তি—কবিতা

১৯১৯/১৩২৬—ভাদ্র—সওগাত—স্বামীহারা—গল্প

১৯১৯/১৩২৬—আশ্বিন—সওগাত—কবিতা সমাধি—কবিতা

১৯১৯/১৩২৬---কার্তিক---বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা—হেনা—গল্প

১৯১৯/১৩২৬—পৌষ—প্রবাসী—আশায়—কবিতা
১৯২০/১৩২৬—মাঘ—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা—ব্যথার-দান—গল্প
১৯২০/১৩২৬(?)—ফাল্গুন-চৈত্র—নূর—ঘুমের ঘোরে—গল্প
১৯২০/১৩২৭—বৈশাখ—নূর—রিক্তের-বেদন—গল্প
১৯২১/১৩২৭—মাঘ—নূর—মেহের নেগার—গল্প
১৯২১/১৩২৭---মাঘ---বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা—সাঁঝের তারা—গল্প
তালিকা থেকে দেখা যায়, প্রথম পর্যায়ে নজরুলের প্রকাশিত রচনার মধ্যে গল্পের সংখ্যা ৯ এবং কবিতার সংখ্যা ২, তার মধ্যে একটি অনুবাদ কবিতা।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী'। প্রথম প্রকাশের সময় লেখকের বয়স ২০ বছর। গল্পটি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা হলেও গল্পটিতে তাঁর বর্ণনাভঙ্গি ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের তির্যকতা, জড়তাহীন বেগবান বাক্যবন্ধ, অনুষঙ্গ প্রয়োগের বিশিষ্টতা, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি ও প্রয়োগের নিজস্বতা আমাদের সচকিত করে দেয়। রবীন্দ্র-অনুষঙ্গ ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করা যাক : ''বাস্তবিক সেরকম প্রহার আমি জীবনে আশা করিনি। চপেটাঘাত মুষ্ঠ্যাঘাত, ইত্যাদির চার হাত পায়ের যত রকম আঘাত আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে সব যেন রবি বাবুর গানের ভাষায় ''শ্রাবণের ধারার মতো'' পড়তে লাগলো। ''আমার মুখের পরে, পিঠের পরে''। মূল গানের 'মুখের পরে বুকের পরে' (বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী) --কি কৌশলে বক্তব্যের মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতিরেখে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বদলে নির্বিকারভাবে 'পিঠের পরে' লিখে দিলেন কবি! এক উদীয়মান যুবক লেখকের হাতে রবীন্দ্রনাথের এমন দুঃসাহসিক বদল বুঝিয়ে দিচ্ছিল এই শিল্পীর দৃষ্টি-শক্তির সম্ভাবনা। 'ব্যথারদান' নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৩২৮ (ফেব্রুয়ারি ১৯২২)। বলা বাহুল্য, এটি কবি বলে বিখ্যাত নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। কিন্তু কাব্যগ্রন্থ নয়। গল্প সংকলন। এতে সংকলিত হয়েছে ৬ টি গল্প। ১. ব্যাথারদান, ২. হেনা, ৩. বাদল-বরিষণে, ৪. ঘুমের ঘোরে, ৫. অতৃপ্ত কামনা এবং ৬. রাজবন্দীর চিঠি।

প্রথম গ্রন্থের এই উৎসর্গপত্রেই আছে, সেই নাম না জানা পিয়ার উদ্দেশ্যে লেখা রক্ত লেখা : ''মানসী আমার/মাথার কাঁটা নিয়েছিলাম বলে ক্ষমা করনি,/তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম''। এই মাথার কাঁটার বাস্তব অস্তিত্বের সংবাদ মেলে মুজফফর আহমেদের স্মৃতি চারণায়। তিনি জানান, সৈন্যবাহিনী থেকে নজরুল যখন এসে তাঁর কাছে উঠেছিলেন তখন, তাঁর সেই সৈনিক জীবনের 'গানি ব্যাগ' এর মধ্যে নানান পত্র-পত্রিকা, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ ও নানান টুকিটাকির সঙ্গে ছিল একটি সেকালে মেয়েদের খোঁপার রূপার কাঁটা। পরবর্তীতে পুলিশের হাতে তছনছ হবার ফলে সেই ব্যাগের জিনিসপত্রের আর হদিস মেলেনি।

''মানসী আমার/মাথার কাঁটা নিয়েছিলাম বলে ক্ষমা করনি,/তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম''। এই মাথার কাঁটার বাস্তব অস্তিত্বের সংবাদ মেলে মুজফফর আহমেদের স্মৃতি চারণায়। তিনি জানান, সৈন্যবাহিনী থেকে নজরুল যখন এসে তাঁর কাছে উঠেছিলেন তখন, তাঁর সেই সৈনিক জীবনের 'গানি ব্যাগ' এর মধ্যে নানান পত্র-পত্রিকা, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ ও নানান টুকিটাকির সঙ্গে ছিল একটি সেকালে মেয়েদের খোঁপার রূপার কাঁটা। পরবর্তীতে পুলিশের হাতে তছনছ হবার ফলে সেই ব্যাগের জিনিসপত্রের আর হদিস মেলেনি।

কিশোর নজরুলের প্রথম প্রেমের সঙ্গিনী, আমাদের নাম না জানা সেই মেয়ে। সম্ভবত ব্যথার দানে-র অধিকাংশ গল্পের নায়িকা সেই কবি-'মানসী'। কবি তাঁকে জীবনে পাননি। কিন্তু 'ব্যথার দান' পর্বের লেখালেখিতে তারই অবিসংবাদিত প্রভাব। কবির সৈনিক জীবনের রোমান্সের মূলে ছিল সেই নারীর অরূপ উপস্থিতি।

আমরা আগেই জেনেছি 'ব্যথার দান' গল্পটি ১৩২৭ এর মাঘ সংখ্যার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্যাথার দান গল্পের দারা ও সয়ফুলমুল্‌ক আফগানিস্থান ককেশাস হয়ে লাল ফৌজে যোগ দেয়। এবং বিপ্লব বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। Red Army-র বাংলা 'লাল ফৌজ' করেছেন নজরুল। নজরুল গল্পে লিখেছেন : ''যা ভাবলুম তা আর হ'ল কই। ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই লাল ফৌজ সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হয়েছে। ... আমার আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তি সঙ্ঘের একজন। ... দারা বললে, এর চেয়ে ভালো কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না তাই এ দলে এসেছি।'' পত্রিকায় প্রকাশের সময় মোজফফর আহমদ এই 'লাল ফৌজ' কথাটি বদলে 'মুক্তি সেবক সৈন্য' লিখেছেন। কারণ সেই সময় ব্রিটিশ ভারতে রুশ বিপ্লব বা লেনিন ও মার্কস সম্পর্কে কোনো লেখালেখি বা আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল। এ ধরণের কাজ ছিল আইনত অপরাধ। তা ছাড়া নজরুল ছিলেন ব্রিটিশ বাহিনীর একজন সৈনিক। এজন্য এতে তাঁর বিপদও হতে পারে।

এ ছাড়া প্রত্যক্ষ দেশপ্রেমের আবেগবাহী এই গল্প নিয়ে ভয় ছিল প্রেসের কর্মীদেরও। সদ্য জালিয়ানওয়ালাবাগের বীভৎসতা মানুষের মনে তখনো দগদগে। তাই ব্যথার দানে-র এই সব পংক্তি ছিল যথেষ্ট আতঙ্কের : ''অনেক দিন পরে তোমার বুকে ফিরে এসেছি। আর মাটির মা আমার, কত ঠাণ্ডা তোমার কোল! ... মাতৃস্নেহের ঐ মস্ত শিকলটা আপনা হ'তে ছিঁড়ে গিয়েছে বলেই আজ মার চেয়েও মহীয়সী আমার জন্মভূমিকে চিনতে পেরেছি''।

ব্যাথার দান-এর নায়ক দারা। নায়িকা বিদৌরা। এছাড়া উল্লেখযোগ্য চরিত্র সয়ফুলমুল্‌ক। প্রত্যেক চরিত্র এখানে ব্যক্তিগত কথা বলেছে। আঙ্গিকের দিক থেকে রজনী বা ঘরে বাইরে-র (১৯১৬) উত্তরসূরী ব্যথার দান। এই ছোট গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আবেগের অতিশয্যে আবৃত প্রায়। চরিত্রগুলি একঘেয়ে রোমাণ্টিকতার সূক্ষ সূত্রে গ্রথিত। আসন্ন কল্লোলীয় (১৯২৩) বোহেমিয়ান জীবনবোধ দারার মধ্যে বর্তমান। বিশ্বাসঘাতিনী মানসীকে ক্ষমা করতে না পেরে এক গভীর বিরহ ব্যথা নিয়ে গৃহত্যাগী, দেশত্যাগী, সৈনিক দারা নিজের দেশ গোলেস্তান থেকে সুদূর হিন্দুস্তান পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। কিন্তু স্মৃতির প্রদাহ তাকে আজও জ্বালায়।

বিদৌরা ব্যথার দানের রোমাণ্টিক এক নারী। এই গল্পের নায়িকা সে। নজরুলের ব্যক্তিগত প্রথম প্রেমের অলক্ষিত সমস্যার লিখিত রূপ বোধকরি বিদৌরার আত্মকথা। বিদৌরার জীবনের যে সমস্যা তা এক সামাজিক ও রোমাণ্টিক নারীর মিলিত সমস্যা। একজনকে দিয়েছে সে মন, অন্যজনকে দেহ। অন্তর ও বাইরের এই দ্বন্দ্বে সংযত থাকতে পারেনি নারী বিদৌরা। এক দিকে প্রেমের অন্তহীন অশান্তি, অন্যদিকে কামনার দারুণ দহন। পুষ্পিত যৌবনের ভারে অসহায় বিধ্বস্ত বিদৌরা ধরা দিল, দারার নয়, অন্যজনের কামনায়।

নারীর এই মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমরা দেখেছি, কেবল স্বতন্ত্র পাত্র-পাত্রীর মর্মবেদনা প্রকাশের ধরণ। ভঙ্গি। বলা বাহুল্য, ১৯১৯ এর আগে শরৎচন্দ্রের দেবদাস (১৯১০) বিরাজ বৌ (১৯১৪) বড় দিদি (১৯১৬) শ্রীকান্ত ১ম পর্ব (১৯১৭) চরিত্রহীন (১৯১৭) শ্রীকান্ত ২য় পর্ব (১৯১৮) সমাজের নিষিদ্ধ প্রেম-নির্ভর ছ'খানা উল্লেখ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে। তাছাড়া প্রকাশিত হয়েছে বিন্দুরছেলে, পরিণীতা (১৯১০) বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৫), মেজদিদি (১৯১৫) পল্লী সমাজ (১৯১৬), অরক্ষণীয়া (১৯১৬) পণ্ডিতমশাই, (১৯১৭) নিষ্কৃতি (১৯১৭)। সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী নজরুলের এসব পড়ে ফেলা স্বাভাবিক। তবে শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মৌন মূল যাতনা অনেক সময় তপস্বিনীর শুভ্রতার আড়ালে আবৃত প্রায়। তুলনায় হিন্দু নয়, মুসলমান নারী বিদৌরা তার অধঃপতনের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে পেলে নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলার কথা বলে। কিন্তু বিদৌরা অন্তরের দ্বিধাকে অতিক্রম করে ফিরে যেতে পারে না দারার কাছে। আবার এইখানে বাংলা সাহিত্যের 'নষ্ট নারীর' ও পরে শরৎচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য দারার কথা থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে শান্ত মানসিকতার বিদৌরা একদিন ফুল ও গানের মালায় বরণ করবে দারাকে। এক দিন বিদৌরা কে ক্ষমা করতে তার কাছে পৌঁছবে দারা। সায়ফুলমূল্‌ক, দারা এবং বিদৌরার পবিত্র প্রেমের বিনষ্টির মূলে। কিন্তু বিদৌরা তাকে যতটা নীচ ভাবে, সে যে তা নয়, তা প্রমাণ করে সে। বিদৌরার কাছে ক্ষমা চাওয়ায় এবং আত্মঘাতী হওয়ার ইচ্ছায় যুদ্ধে যোগদানে দারার হতভাগ্য জীবনের প্রতি গভীর ও যথার্থ সমবেদনা সহকারে। গল্পে সায়ফুলমূল্‌ক কে দারা ক্ষমা করেছে। দারা ক্ষমা না করলেও

বোধকরি তার মহত্ব ম্লান হত না। অন্যদিকে যুদ্ধে আহত অন্ধ দারা ক্ষমা করেছে বিদৌরাকেও। কিন্তু এ ক্ষমা যতখানি রোমান্টিক ততখানি বাস্তবিক নয়। বিদৌরাকে ক্ষমা করেও, দেহ মন, অন্তর বাহির, প্রেম-কামের দ্বন্দ্বে সুচিন্তিত সমাধান ঘোষণা করেও সে বলে : ''দেখ বিদৌরা আজ আমাদের শেষ বাসর সজ্জা হবে। তার পর রবির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি যাবে নির্ঝরটার ওপারে আর আমি থাকব এপারে। এই দু পারে থেকে আমাদের দু জনেরই বিরহগীতি দু'জনকেই ব্যথিয়ে তুলবে। আর এই ব্যথার আনন্দেই আমরা দু'জনে দু'জনকে আরো বড়– আরো বড় করে পাবো।''

এতো ছোটগল্পের উপসংহার নয়। কবি নজরুলের অজস্র গীতিকবিতা (যা তখনো সৃষ্টি হয়নি)-র বিস্তৃত মুখবন্ধ। যেসব কবিতায় পরপর সেই আবেগময় উচ্চারণ শুনি :

১. আমি এপার তুমি ওপার
মধ্যে কাঁদে ব্যথার পাথার
(গোপন প্রিয়া / সিন্ধুহিন্দোল)

২. হে মোর প্রিয়
হে মোর নিশীথরাতের গোপন সাথী
মোদের দু' জনারেই জনম ভরে কাঁদতে হবে গো,
শুধু এমনি করে সুদূর থেকে একলা জেগে রাতি।
(নিশীথ প্রতীম)

ব্যথার দানে-র দ্বিতীয় গল্প 'হেনা'। কিন্তু পত্রিকায় হেনা-র প্রকাশকাল ব্যথার দানে-র আগে। হেনা কার্তিক ১৩২৬, ব্যথার দান, মাঘ ১৩২৬। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় হেনা গল্পটি প্রকাশিত হবার পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর সাহিত্য পত্রিকায় মাসিক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে (ফাল্গুন ১৩২৬) লিখেছিলেন, ''হেনা গল্পটি একটি উৎকৃষ্ট রচনা, লেখক প্রতিভা সম্পন্ন সাহিত্যিক, তাঁহার প্রতিভায় অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যাকাশের দিগমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে।''

গল্পটি এক আফগান যুবকের আবেগতপ্ত প্রেমের ইতিহাস। গল্পটির নায়ক সেই। সোহরাব তার নাম। এ গল্প সেই সৈনিকের দিনলিপি রূপে লিখিত। আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য নজরুলের গীতিকবিতা-ধর্মী-গল্প পদ্ধতির সহায়ক হয়েছিল। সুদূর ফ্রান্স জার্মান, বেলুচিস্তান, পেশোয়ার, কাবুল থেকে যেন লিখিত এ গল্পের কাহিনি। যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চের মধ্যেও লিখিত হয়েছে এর দিনলিপি। বোতাম আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান বাঙালি প্রাণের কাছে এ জাতীয় গল্প অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই নতুন আস্বাদ এনে দিয়েছিল। রবীন্দ্রাথের কাবুলিওয়ালাকে আমরা কলকাতার পথে মিনুর বাড়ির দরজায় দেখেছিলাম; কিন্তু নজরুলের এ গল্পের পটভূমি ছড়িয়ে গিয়েছে সুদূর ফ্রান্স থেকে জার্মান, বেলুচিস্তান থেকে পেশোয়ার হয়ে কাবুল। শ্রীকান্তের রেঙ্গুন যাত্রাকে পেছনে ফেলে এ গল্পে নজরুল বাংলা গল্পের ভূগোলকে স্থাপন করেছেন আন্তর্জাতিক পটভূমিতে।

যুদ্ধের রোমাঞ্চকর পরিবেশে এক সৈনিকের অসীম সাহস ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি প্রবণ মনের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে এখানে। নায়কের বক্তব্যের পেছনেও সৈনিক নজরুলের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার অসাধারণ সামঞ্জস্য বারবার ছোটগল্পের সীমানা থেকে লেখকেরই-বন্ধুর অন্তর্লোকে পাঠক কে আকর্ষণ করে। অবশ্য এখানে স্মরণীয়, ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে কর্মরত নজরুল কিন্তু বাস্তবে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে এইসব দূর দেশে কখনোই যাননি। তবু সৈনিক জীবনের

রবীন্দ্রাথের কাবুলিওয়ালাকে আমরা কলকাতার পথে মিনুর বাড়ির দরজায় দেখেছিলাম; কিন্তু নজরুলের এ গল্পের পটভূমি ছড়িয়ে গিয়েছে সুদূর ফ্রান্স থেকে জার্মান, বেলুচিস্তান থেকে পেশোয়ার হয়ে কাবুল। শ্রীকান্তের রেঙ্গুন যাত্রাকে পেছনে ফেলে এ গল্পে নজরুল বাংলা গল্পের ভূগোলকে স্থাপন করেছেন আন্তর্জাতিক পটভূমিতে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও শক্তিশালী কল্পনার অপূর্ব মিশ্রণে এই অসাধারণ শিল্প সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তিনি তাঁর সেই ২০/২২ বছরের বয়সে। এইখানেই তাঁর প্রতিভার অতুলনীয় সাফল্য।

ব্যথার দানে-র আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'ঘুমের ঘোরে'। গল্পের নায়ক আজহার। আফ্রিকার সাহারা মরুদ্যান সন্নিহিত ক্যাম্প থেকে লিখছে তার মনের ব্যাকুল বেদনা-কথা – ডায়রি লেখার ভঙ্গিতে। যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা এই গল্পটির সঙ্গেও যুক্ত। জীবন যুদ্ধে বিক্ষত প্রাণের যাতনা এই কাহিনির মূলে। জীবনে আঘাত পাওয়া আশ্রয় হারা এক মানুষ সর্বশেষ আশ্রয় চাইছে খোদার কাছে।

পরী এ গল্পের নায়িকা। পরী ও আজহারের প্রণয়ের পটভূমিতে নিবিড় কাব্যিক পরিবেশ এখানে বর্তমান। পরীর অনুরাগের কাঙ্ক্ষিত শিহরণ, প্রত্যাখ্যানের নিষ্ঠুর কাঠিন্য আজহারকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। পরীর স্বামী, আজহারের বন্ধু সব কিছু জেনেও সসম্মানে পরীকে গ্রহণ করেছে। এজন্য স্বামীর প্রতি পরী কৃতজ্ঞ।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান নায়ক নায়িকার রোমান্টিক প্রেম-কথা তৎকালীন জীবন-তৃষ্ণাও বলিষ্ঠতা দিয়ে একমাত্র নজরুলই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত প্রেম জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক মাত্রায় ক্রিয়াশীল। —''আসলে তাঁর প্রতিটি গল্পে তাঁরই প্রচণ্ড আবেগ তপ্ত চিত্তের উচ্ছসিত সত্তার প্রক্ষেপ ঘটেছে। তাঁর কল্পিত প্রতিটি প্রেমিক নায়ক চিত্তের গভীরে লেখক নিজেই প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। আর সেই জন্যই তাঁর অধিকাংশ গল্পই সাধারণ বস্তুনিষ্ঠ বিবৃতিমূলক কাহিনী হয়নি। সেগুলি হয় ডায়েরী ধর্মী, নয় পত্রধর্মী অথবা স্মৃতিরোমন্থন''। (দুই বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য—গোপীকানাথ রায় চৌধুরী)

হয়তো এই কারণেই ব্যথার দানে-র গল্পগুলির ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণ বৈচিত্র্যহীন, এক ঘেয়ে। তাঁর অধিকাংশ গল্পেরই নায়ক কবি ও সৈনিক, যোদ্ধা ও বীর, দেশ প্রেমিক ও বেপরোয়া, দারুণ অভিমানী ও নিদারুণ নিষ্ঠুর। গভীর প্রেম-তৃষ্ণা এবং অস্থিরতা ও অতৃপ্ত নিসর্গপ্রীতি এবং রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতিও তাদের অনুরাগ দেখা যায়। তাঁর নায়িকারা কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো অজ্ঞাতে নায়ককে করেছে আহত। ফিরে আসতে চেয়েছে নায়কের কাছে। বা কখনো হয়েছে প্রত্যাখ্যাত। সমস্ত প্রেমই দাগা হয়ে আছে নায়ক ও নায়িকার সারা জীবনে। এই আলোকে ব্যথার দানে-র অন্যান্য গল্পগুলিও আলোচিত।

রিক্তের বেদন (১৯২৫) নজরুলের পরবর্তী গল্প সংকলন। ১৯২৪ এর বড় দিনে লেখা এ গ্রন্থের নিবেদন অংশ দেখে এর প্রকাশ ১৯২৪-এ ভাবার কোনো কারণ নেই। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৩১ (ডিসেম্বর ১৯২৪)-এ। প্রকাশক ছিল ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স। এই গ্রন্থে মোট গল্পের সংখ্যা ৮। ১. রিক্তের বেদন, ২. বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী, ৩. মেহের-নেগার, ৪. সাঁঝের তারা, ৫. রাক্ষসী, ৬. সালেক ৭. স্বামীহারা ৮. দুরন্ত পথিক।

রিক্তের বেদন ডায়েরি ধর্মী লেখা। শৈলজানন্দ যেভাবে নজরুলের যুদ্ধে যাবার ইতিকথা বর্ণনা করেছেন তাঁর 'আমার বন্ধু নজরুল' গ্রন্থে, এ গল্প যেন তারই তথ্যপূর্ণ ধারাবাহিক বর্ণনা। এ গল্পে উল্লিখিত স্থান ও সময়কে সাজানো হয়েছে এই ভাবে : বীরভূম, সালার, রেলপথে (অন্ডালের কাছাকাছি), রেলগাড়ি (নিশিভোর), ঐ প্রত্যুষে, লাহোরের অদূরে (নিশীথ) নৌশেরা, কুর্দিস্থান, কারবালা, আজিজিয়া, ... আমরা শেষ বসন্তের নিশীথ রাত্রি) করাচী, (মেঘম্লান সন্ধ্যা-সাগর বেলা)। গল্পে উল্লিখিত সমস্ত জায়গায় নজরুল অবশ্য যাননি। ভারত তথা করাচী ও নৌশরার বাইরেই যাননি। (নজরুল কাব্য পরিচয়—শ্রী মধুসূদন বসু)। কিন্তু নিজস্ব শক্তিশালী কল্পনায় নিশ্চয়ই আরবের কারবালা প্রভৃতি এলাকা (যেদিকে তাঁদের সৈন্যবাহিনীর যাবার কথা ছিল ও অনেকে গিয়েওছিলেন)-র পরোক্ষে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভর করে সেখানকার ভূপ্রকৃতির আশ্চর্য এক রম্যভাষারূপ দিয়েছেন তিনি : ''আঃ, আজ এই আরবের উলঙ্গ প্রকৃতির বুকে মেঘমুক্ত শুভ্র জ্যোৎস্না পরে তাকে এক শুক্লবসনা সন্ন্যাসিনীর মত দেখাচ্ছে। এদেশের এই জ্যোৎস্না এক উপভোগ করবার জিনিস। পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি জ্যোৎস্না এত তীব্র প্রখর নয়। দেখে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে এগুলি জ্যোৎস্নালোকে তোলা ফটো।" ব্যথার দানে-র কয়েকটি গল্পের মত এই রিক্তের বেদন-ও একটু পরে লেখা 'শাত ইল আরব, ফাতেহ-ই দোয়াজ দহম, আবির্ভাব ও তিরোভাব' প্রভৃতি কবিতায় কবি অসাধারণ দক্ষতায় এই দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া তথা আরব দুনিয়ার ভূগোলের নিসর্গসৌন্দর্যের কথা বলেছেন।

রিক্তের বেদন গল্পের নায়ক বুকের ভেতর তার প্রাক্ সৈনিক জীবনের প্রিয়া শহীদার স্মৃতিটুকুও বিসর্জন দিয়ে বীর, রিক্ত ও

মুক্ত হবার সাধনা করেছে। তার স্বগত চিন্তা যার প্রাণের গোপন তলে এখনো কামনা জেগে রয়েছে, সে ভোগী মিথ্যুক আবার ত্যাগের দাবী করে কোন লজ্জায়? সে কাপুরুষের আবার বীরের পবিত্র শিরস্ত্রাণের অবমাননা করবার কি অধিকার আছে? দেশের জন্য প্রাণ দেবে যারা, তারা প্রথমে হবে ব্রহ্মচারী, ইন্দ্রিয়জিৎ। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ-এর কথা মনে পড়ে যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। কিন্তু এ কাহিনি-চরিত্রই আলাদা।

এই জিতেন্দ্রীয় নায়কের জীবনে আবার আসে প্রেম। এক বেদুইন নারী (গুল)-র শক্তিমান কামনার আকর্ষণে বিক্ষত ও পর্যুদস্ত হয় নায়কের যুবক হৃদয়। তার উদ্দাম স্বাধীন প্রণয় অবশেষে নায়ককে জয় করে নিল। কিন্তু এই বন্ধন ও ছিন্ন করতে পারলো নায়ক। এবং এ জন্য সে তার খোদাকে ধন্যবাদ দেয়। এই বন্ধনছিন্নের ইতিহাস গল্পটির উপসংহারকে অশ্রুরক্ত ও স্নেহের উত্তাপে দুঃসহ সুন্দর করে তুলেছে।

নজরুলের আর একটি গল্প 'মেহের নেগার' 'নূর' পত্রিকার ১৩২৭ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত, পরে রিক্তের বেদন এ সংকলিত। এর নায়ক য়ুসুফ এক গান বাজনা শেখা কবি পাগল মানসিকতার লোক। তার স্বপ্নে দেখা নারীকে সে আবিষ্কার করে বাস্তব এক রমণীতে। নাম তার গুলসন। খুরশেদ জান বাঈজীর মেয়ে। য়ুসুফের পবিত্র আবেগমত্ত ভালোবাসা সে শ্রদ্ধাভরে অস্বীকার করতে চায়। কেননা তার যুক্তি ''রূপজীবিনীর কন্যা আমি, ঘৃণ্য, অপবিত্র! ওগো আমার শিরায় সে অপবিত্র, পঙ্কিল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।" সে যাকে ভালোবাসে তাকে অপমান করতে পারবে না বলে সে আত্মঘাতিনী হয়েছে। আর তার কবরের লেখনে লেখা আছে তার ভালোবাসার স্বীকৃতি : ''যেখানেই থাকি প্রিয়তম, আমাদের মিলন হবেই"। এর পর আমরা সংগীত প্রিয় য়ুসুফকে দেশের স্বার্থে তরবারি ধরার দীপ্ত শপথে উদ্ভাসিত হতে দেখি।

এই সংকলনের 'স্বামীহারা' গল্পটি বিধবা নারী বেগম-এর মর্মন্তুদ কাহিনি; সালেমার কাছে তার আত্মকথনে প্রকাশিত সেই আবেগময় উচ্ছ্বাস। বেগমের শূন্যতাবোধের প্রকাশে প্রকৃতি ও কাব্যপ্রীতির অপূর্ব সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। শিক্ষিত মুসলমান নারী বেগমের মধ্যে যে এই কাব্য প্রীতি তথা রবীন্দ্র-মনস্কতা তা যদিও নজরুলের ব্যক্তি মনেরই পরিচায়ক; তবু বলতে হবে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান নারীর মনোলোকের এ এক নতুন সংবাদ। নজরুল এর নিজস্ব সংযোজন। সৈয়দ মুজতবা আলীর শাহরইয়ার এর অনেক আগে একাজ নজরুল করতে

'স্বামীহারা' গল্পটি বিধবা নারী বেগম-এর মর্মন্তুদ কাহিনি; সালেমার কাছে তার আত্মকথনে প্রকাশিত সেই আবেগময় উচ্ছ্বাস। বেগমের শূন্যতাবোধের প্রকাশে প্রকৃতি ও কাব্যপ্রীতির অপূর্ব সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। শিক্ষিত মুসলমান নারী বেগমের মধ্যে যে এই কাব্য প্রীতি তথা রবীন্দ্র-মনস্কতা তা যদিও নজরুলের ব্যক্তি মনেরই পরিচায়ক; তবু বলতে হবে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান নারীর মনোলোকের এ এক নতুন সংবাদ। নজরুল এর নিজস্ব সংযোজন।

পেরেছিলেন।

আমরা আশ্চর্য হই যখন বেগম বলে—''এ সীমার মাঝে অসীমের সুর বেজে উঠবে সে আর কখন? এখন সে দিন শেষ হয়ে এল, ঐ শুভ্র নদীপারের বিদায় গীত শুনা যাচ্ছে, খেয়া পারে ক্লান্ত মাঝির মুখে : দিবস যদি সাঙ্গ হল না যদি গাহে পাখি" অর্ধ-উন্মাদ এই নারী তার শৈশবের সব চেয়ে প্রিয় স্থানটিতে, যেখানে তার ছোট ভাই বোনদের ও স্বামীর কবর, বসে গভীর দার্শনিকতায় ডুবে যায়। ইসলামিক সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত ধারণা তার জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কে চিন্তায় সে বাংলা সাহিত্যের একটি স্বাতন্ত্র্য নারী চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত হয় : ''শুনেছি যে জায়গাটার মাটি নিয়ে খোদা আমাদের পয়দা করেন নাকি ঠিক সেই জায়গাতেই আমাদের কবর হয়, আর তাই আমরা স্বততই কেমন একটা নিবিড় টান অন্তরে অন্তরে অনুভব করি। এখন তাহেরার কবরটি যেমন ধসে পড়েছে আর ওর মধ্যে একটি ধলা হাড় দেখা যাচ্ছে, হয়তো সে কত বছর বাদে আমারও

করতে পারলো নায়ক। এবং এ জন্য সে তার খোদাকে ধন্যবাদ দেয়। এই বন্ধনছিন্নের ইতিহাস গল্পটির উপসংহারকে অশ্রুরক্ত ও স্নেহের উত্তাপে দুঃসহ সুন্দর করে তুলেছে।

নজরুলের আর একটি গল্প 'মেহের নেগার' 'নূর' পত্রিকার ১৩২৭ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত, পরে রিক্তের বেদন এ সংকলিত। এর নায়ক য়ুসুফ এক গান বাজনা শেখা কবি পাগল মানসিকতার লোক। তার স্বপ্নে দেখা নারীকে সে আবিষ্কার করে বাস্তব এক রমণীতে। নাম তার গুলসন। খুরশেদ জান বাঈজীর মেয়ে। য়ুসুফের পবিত্র আবেগমত্ত ভালোবাসা সে শ্রদ্ধাভরে অস্বীকার করতে চায়। কেননা তার যুক্তি ''রূপজীবিনীর কন্যা আমি, ঘৃণ্য, অপবিত্র! ওগো আমার শিরায় সে অপবিত্র, পঙ্কিল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।" সে যাকে ভালোবাসে তাকে অপমান করতে পারবে না বলে সে আত্মঘাতিনী হয়েছে। আর তার কবরের লেখনে লেখা আছে তার ভালোবাসার স্বীকৃতি : ''যেখানেই থাকি প্রিয়তম, আমাদের মিলন হবেই"। এর পর আমরা সংগীত

কবর এরকম ধ্বসে যাবে আর আমার বিশ্রী হাড়গুলো উলঙ্গ মূর্তিতে প্রকট হ'য়ে লোকের ভয়োৎপাদন করবে।"

বি. এ. পাশ করে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা করেছিল আজিজ। বি. এ. পাশের পর সে বেগমকে বিয়ে করলো। অর্থনৈতিক অসমতায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াটা যে সমাজে সহজসাধ্য নয় এ দিকে দৃষ্টি আছে লেখকের। অন্তত আত্মীয় বন্ধুরা প্রায়শ হবেন বিরোধী। মুসলমান সমাজে পরিবারের ওপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ ততটা না থাকলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে সমাজ তার প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ গল্পে বেগমের দেওয়া তথ্য : ''তাই উনি আর ওঁর মা বললেন,' আমাদের সমাজই নাই ত সমাজ চ্যুত করবে কে? সমাজ তবুও অবোধ শিশুর মত কোন সাড়াই দিল না। কিন্তু ওঁদের বাড়িতে যে সব গরীব বেচারারা আস্‌ত তাদের খুব কড়া ভাবেই শাসন করা হল, যেন কেউ ওঁদের বাড়ীর ছায়াও না মাড়ায়।"

গ্রামে কলেরা আর বসন্ত এই সময়ে হানা দিল। এম. এ. পাশ করে ল পড়তে থাকা আজিজ গরমের ছুটিতে গ্রামে এল; আর্তের সেবায় জীবন দিল সে। শিক্ষিত মেয়ে বেগমেরও মনে অমঙ্গল বোধের গ্রামীণ সংস্কার বর্তমান। কিন্তু সে সেই সংস্কার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাহীন হলেও বেগমের যুক্তিবাদী মনকে ব্যক্ত করে এরূপ তথ্য। কিন্তু অন্যের বেলায় ওই অন্ধ সংস্কারও স্বার্থপরতা মিশ্রিত হয়ে কী জঘন্য নাটক ঘটাতে পারে তার বর্ণনা পাই আজিজের মৃত্যুর পর বেগমের ওপর আজিজের কোন আত্মীয়ের অত্যাচারের সংবাদে। বেগমের বর্ণনা : ''ওদের কে একজন আত্মীয় আমার চুল ধরে বললে যে, 'শয়তানী বেরো ঘর থেকে এখনি। তখনি বলেছিলুম, বুনিয়াদী খানদানের উপর ... এ সইবে কেন? তোকে ঘরে এনে শেষে বংশে বাতি দিতে পর্যন্ত রইল না কেউ। বেরো রাক্ষুসী, আর গাঁয়ের লোকের সামনে মুখ দেখাস না। আর ইচ্ছা হয় চল, তোর আর একটা নেকা দিয়ে দি।" এই জঘন্য নৃশংসতা জঘন্যতম মনে হয় তখন যখন দেখি মৃত স্বামীর লাশ কাঁধে করে বাইরে আনার সময় স্বামীহারা নারীর ওপর এই ব্যবহার।

মুসলমান সমাজে দ্বিতীয় বিবাহ বা নেকার প্রসঙ্গে নজরুলের নিজস্ব মনোভাব নয় কেবল, ইসলামের আসল আদর্শেরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক এই গল্পে। আর এই জন্যই বেগমকে দিয়ে দাম্পত্য জীবনের নিবিড় আনন্দের এত বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। নেকা সম্পর্কে বেগমের ভাবনাটি উদ্ধার যোগ্য। সম্ভবত এটি নজরুলেরও ব্যক্তিগত মনোভাব : ''ওগো নেকা কি? সে কি দু'বার অন্যের গলায় মালা দেওয়া, শাস্ত্রে নেকার কথা আছে, সে কাদের জন্য? আচ্ছা ভাই, যারা বাধ্য হয়ে অন্ন বস্ত্রাভাবে বা আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে পবিত্রতাকে নারীত্বকে ওরকম মাড়িয়ে চলে যায় তাদের কোথাও ক্ষমা নাই। ভালবাসা– স্বর্গের এমন পবিত্র ফুল কে কামনার শ্বাসে যে কলঙ্কিত করে তার উপযুক্ত বোধহয় এখনো কোনো নরকের সৃষ্টি হয় নাই। মৌলবী সাহেবরা হয়তো খুব চটে আমার জানাজার নামাজই পড়বেন না, কিন্তু মানুষ আর মৌলবীতে অনেক তফাৎ– শাস্ত্র আর হৃদয়ে অনেক তফাৎ।" এই গল্প প্রকাশের ১ বছরের পরে পরেই নজরুল চাকরি থেকে কলকাতায় আসার (১৯২০) ২/৩ দিনের মধ্যে ৭/৮ দিনের জন্য চুরুলিয়ায় যান, দেশের বাড়িতে। এবং সেখানে মায়ের সঙ্গে কোন কারণে মতান্তর ঘটে। নজরুল জন্মের মত ত্যাগ করেন জননী ও জন্মভূমির সংস্পর্শ। এর পেছনে আছে নজরুলের মাতার দ্বিতীয় বিবাহ। এটা নজরুল চাননি। তাঁর তরুণ প্রাণ বেগমের মতই আবেগ তাড়িত ছিল সেদিন। তাছাড়া এই গল্পের সুবাদে উঠে এসেছে, নজরুলের সঙ্গে ইসলামের মৌলবী সম্প্রদায়ের সম্পর্কের একটা প্রত্যক্ষ পরিস্থিতি। মৌলবীদের অনেক সময় শাস্ত্র বচনের আক্ষরিক অনুসরণের নিষ্ঠুরতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ নজরুল। অসংকোচে তিনি এই গল্পে সমস্যাটা তুলে ধরেছেন।

নজরুলের শেষ গল্পগ্রন্থ 'শিউলিমালা' প্রকাশিত হয় ১৯৩১-এ। প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরি। মোট ৪টি ছোট গল্প এতে স্থান পেয়েছে। পদ্ম-গোখ্‌রো, জিনের বাদশা, অগ্নিগিরি ও শিউলিমালা। উল্লেখ্য 'শিউলিমালা' নামে নজরুলের আরো একটি গ্রন্থ আছে, গানের সংকলন। তার প্রকাশকাল ১৯৩৫।

যাই হোক, ১৯২৮ এ নজরুল যখন ঢাকায় যান তখন সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠতা হয় তার স্মৃতি এই গ্রন্থের শিউলিমালা গল্পে ছায়া ফেলেছে। বলা বাহুল্য, গল্পটি, নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত। গল্পের নায়ক আজহার অবিবাহিত, অবস্থাপন্ন তরুণ ব্যারিষ্টার। আজহার দাবা খেলায় আসক্ত। সঙ্গীতজ্ঞ। প্রকৃতি প্রীতিও তার মধ্যে রয়েছে। তার মধ্যে আছে গভীর বিষণ্ণতা। যার মূলে একটি প্রেমের অভিজ্ঞতা জড়িয়ে। আজহার প্রফেসর চৌধুরীর বাড়িতে অতিথি হয়ে যে দীর্ঘ একমাস কাটিয়েছিল, গান ও দাবার সাহায্যে সে যে এক হিন্দু পরিবারের মধ্যে নিজের স্মরণীয় আসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল, এটা নজরুল নিজের

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে রচনা করেছিলেন বলে হয়তো বিষয়টা অনেকটা বিশ্বাস্যতা পেয়েছে গল্পে। এই অংশের বর্ণনায় কিছুটা রোমান্সের রং মিশেছে। আর এর উৎস মূলে আছে প্রফেসর চৌধুরীর কন্যা শিউলি। হিন্দু কন্যা শিউলির প্রতি মুসলমান আজহারের নীরব অথচ আবেগান্দোলিত প্রেমের পবিত্র স্মৃতিই গল্পটির মূলকথা।

এই সংকলনের পদ্ম-গোখরো গল্পটিতে একটি মুসলমান পরিবারের কাহিনি আছে। গল্পের সূচনায় অর্ধ-অনশন ক্লিষ্ট কিন্তু একদা ঐশ্বর্যপূর্ণ জমিদার পরিবারের সহসা বড়লোক হবার সংবাদ রয়েছে। মীর সাহেবের পৌত্র আরিফের সংসারে আরিফের স্ত্রী পয়মন্ত জোহরার সর্প-প্রীতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এ গল্পে। সমাজের অর্থনৈতিক বিবর্তনের কোনো বিশ্লেষণ নয়, পদ্ম-গোখরো নিতান্তই রূপকথা ধর্মী রচনা। পরিবারের প্রাচীনকালের সঞ্চিত মোহরের উপর ভর করে কয়লার ব্যবসা এবং কর্পোরেশনের কণ্ট্রাক্টরির মধ্যে দিয়ে আরিফের আশাতিরিক্ত লাভ, কেবল কাহিনির রূপকথালোক সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে তা নয়; বুদ্ধিমতী, যুক্তিবাদী রূপসী জোহরার অতৃপ্ত মাতৃহৃদয় যে করুণা ও স্নেহে সাপদের নিয়ে আদর করে, ঘুম পাড়ায়, সস্নেহ তিরস্কার করে– এ সব বর্ণনা বাংলাদেশের রূপকথালোকে পাঠককে মুহূর্তে নিয়ে যায়।

'জিনের বাদশা' গল্পে ফরিদপুর জেলার মোহনপুর গ্রামের চাষী মুসলমানদের কথা বর্ণিত। মুসলমান প্রধান এই গ্রামের এক প্রান্তে কিছু কায়স্থের বাস। হিন্দু এই ক'ঘর মুসলমানদের 'বন্ধুত্ব'কে ভয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেন। সংক্ষিপ্ত এই তথ্যটি মূল গল্পের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হলেও সমাজে হিন্দু মুসলমান পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারে মুল্যবান।

এই গল্পে আছে মাতব্বর চুন্নু ব্যাপারী। তার তিন বিবাহ। সন্তান সংখ্যা-৭। তৃতীয় স্ত্রীর তীব্র প্রতিরোধে ৪র্থ বিবাহ সম্ভবপর হচ্ছে না বলে তার আফশোস। চুন্নুর তৃতীয় পক্ষের তৃতীয় সন্তান আল্লারাখা এই গল্পের নায়ক। দুঃশীল, দুঃসাহসী দুঁদে ছেলে। পুঁথিপড়া বিদ্যায় 'আধুনিক' সে। তার বিলাসিতার খরচ চালাবার ব্যাপারে সে যেভাবে বাপের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা অতিরঞ্জন বলে মনে হলেও বর্ণনার শ্লেষাত্মক ভঙ্গিটুকু রচনাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। এই গল্পে তৎকালের গ্রামীণ মুসলমান জীবনের কিছু জীবন্ত চিত্রও পাওয়া যাবে।

অগ্নিগিরি গল্পটিও গ্রামীণ জীবনের কাহিনি নিয়ে রচিত। মুসলমান সমাজের অল্প বিস্তর পরিচয়ও আছে এখানে। ধর্মশাস্ত্রীয় আলোচনার আসর, মাদ্রাসা শিক্ষা ইত্যাদির কথা থাকলেও গল্পের ভিত্তিটা দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থাতে। গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় : প্রেম একান্ত শান্ত সবুরকেও বিপুল বিদ্রোহে কাঁপাতে পারে : ''আজ চিরদিনের শান্ত সবুর চঞ্চল মুখর হয়ে উঠেছে। মৌনী পাহাড় কথা কয় না, কিন্তু সে যেদিন কথা কয় সেদিন সে হয়ে ওঠে অগ্নিগিরি।''

তাঁর ছোট গল্পগুলিতে ইসলামিক জীবন প্রতিবেশের একটা স্বাদ ও আবেশ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন নজরুল। যা বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় বিশিষ্ট। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁর কোনো গল্পই অর্জন করেনি ছোটগল্পের সেই নিটোল অবয়ব বা চরিত্র। তাঁর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে কখনো বস্তুভারহীন গীতিকাব্যের রসে সম্পৃক্ত। কখনো তা রূপকথা লোকের গল্প কথায় আবৃত। ছোটগল্পের বাঁধন, বিষয় বিন্যাস রীতি কিছুই আবেগী কবি গ্রাহ্য করেননি। তাঁর ব্যাথার দানে-র লেখাগুলি এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সমালোচক জানচ্ছেন, ''ছোট গল্প হিসেবে সার্থক না হলেও শব্দ প্রয়োগ, ভাষা বিন্যাসে, চরিত্রের আবেগাতিশায্যে, কল্পনার উজ্জ্বলতায় তাঁর গল্পগুলি একান্ত স্বকীয় একটি চরিত্র লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।'' গোপিকানাথ রায়চৌধুরী-র এই প্রশংসার পাশাপাশি নজরুল গবেষক আজহার উদ্দীন খান এর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ আমরা স্মরণ করতে চাই। কেননা ছোটগল্পকার নজরুল সম্পর্কে তাঁর এই কথাগুলি গল্পকার নজরুলের প্রতিভার সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধেরেছে : ''ছোট গল্প ও উপন্যাসে তাঁর হাত খুবই কাঁচা। তাঁর প্রতিভার অভিব্যক্তির উপযুক্ত বাহন কবিতা ও গান– গল্প উপন্যাস বা নাটক কোনটাই নয়। গল্প উপন্যাস নাটকে তাঁর অসংযত মনের পরিচয় দুঃসহ ভাবে প্রকটিত। বিষয়বস্তুর চেয়ে উচ্ছ্বাসটা বড্ড বেশী, সময় সময় মনে হয় এগুলি গদ্য ভাষায় কাব্য অথচ ছোট গল্প লিখতে হলে চাই একটি রসঘন নিবিড়তা, অতি মাত্রায় সংযম ও পরিমিতি জ্ঞান, উপন্যাসে চাই বিচিত্র ও জটিল দ্বন্দ্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আর নাটকে চাই একটি সুখ দুঃখময় আনন্দ বেদনায় জীবনের সচল ঘটনা স্রোত। এ গুলির মধ্যে কোনোটাই সূক্ষ্মভাবে নজরুলের হাত দিয়ে বেরুল না। অতএব নাটক গল্প উপন্যাস তাঁর মহৎ প্রতিভার অসাফল্যের স্বীকৃতি, একথা যদি সোজাসুজি ভাবে বলি তা হলে নজরুলানুরাগিরা আমার অপরাধ নেবেন না।'' (বাংলা সাহিত্যে নজরুল)

গল্পকার নজরুল ইসলাম

মহম্মদ ইব্রাহিম

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই কবি নজরুলের নাম উচ্চারিত হয়। পৃথিবী জুড়ে বাঙালির মনে-মননে নজরুলের কবিতা চির অম্লান। তারপরেও বাংলা সাহিত্যের বহু পণ্ডিত নজরুল প্রতিভার আলোচনায় সুবিচার করেননি। কিছুদিন আগে (২০২১) নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। অথচ, এ বাংলার বিশিষ্ট পত্রিকা গোষ্ঠী নজরুলকে নিয়ে কোনো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেনি। ব্যতিক্রমী নখে গোণা দু'একটি পত্রিকা ছাড়া অসমদর্শী মূল্যায়নের পরম্পরা আজও চলছে। আলোচক তপোধীর ভট্টাচার্য, 'বাঙালির আধুনিক সংস্কার ও নজরুল পুনর্বিবেচনা' প্রবন্ধে লিখেছেন—"যাঁরা কবিতা লেখেন বা ছোট পত্রিকা আন্দোলনে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের সৃষ্টিশীলতার সংজ্ঞানুযায়ী নজরুল পদ্য রচয়িতা মাত্র —খাঁটি কবি নন।" বুদ্ধদেব বসু 'নজরুল' প্রবন্ধে লিখেছেন - "নজরুল চড়া গলার কবি .... তাঁর কাব্যে হৈ চৈ অত্যন্ত বেশী ... একারণেই তিনি লোক প্রিয়।" এই মূল্যায়নকে অনেকেই আপ্ত বাক্য বলে মেনে নিয়েছেন। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এক জায়গায় লিখেছেন, "রাজনীতি চর্চা, উচ্চকণ্ঠ, দরিদ্র-প্রীতি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা-চিন্তাধারা হিসেবে মহৎ হলেও উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম দেয়নি। নজরুলের জনপ্রিয়তা এই কারণেই। কিন্তু কবিতা হিসেবে এরা মূল্যবান নয়।" এ পরম্পরা মেনেই গল্পকার নজরুল এই বঙ্গের আলোচকদের কাছে অবহেলিত। এক্ষেত্রে তাঁরা এতটাই উন্নাসিক যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা এবং ছোটগল্প বিষয়ক আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে কেউ গল্পকার নজরুলের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। বহু চিন্তকের চিন্তার দুর্দশা বহুজনীন অন্তরে নজরুল প্রতিভার সম্পর্কে অপ্রতীতি সৃষ্টি করেছে। বাঙালি পাঠক হিসেবে নজরুলের এই অপমান মেনে নেওয়া ভীষণ কষ্টকর!

নজরুল বাংলা সাহিত্যে একজন ব্যতিক্রমী গল্পকার। নজরুলের গল্প-জীবনে সৈনিক জীবনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রথম দিকের অনেক গল্পই করাচির সেনানিবাসে বসে লেখা : 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'স্বামীহারা', 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'মেহের নেগার', 'ঘুমের ঘোরে' গল্পসমূহ। ফলে, গল্পগুলিতে সৈনিক জীবনের নানা প্রসঙ্গই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সেনা-জীবনের অভিজ্ঞতা সুখ-দুঃখ, যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধের বর্ণনা তথা একজন সৈনিকের আত্মকথন গল্পগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। গল্পের অনেক নায়কই যুদ্ধ সৈনিক। গোলাম মুরশিদের কথায়, তিনি যে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রত্যক্ষদর্শীর জলজ্যান্ত বর্ণনা বলে মনে হয়। যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেম, রোমান্স, রোমাঞ্চকর প্রকৃতি প্রেক্ষিত। এর সঙ্গে প্রেম, আবেগ ও গীতিধর্মিতা (Lyric) মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক ভিন্নধর্মী গল্পভুবন নির্মাণ করেছেন গল্পকার নজরুল। নজরুলের বেশ কিছু গল্পের প্রেক্ষাপট প্রসারিত হয়েছে বাংলার সীমা ছাড়িয়ে দূরতরক্ষেত্রে। গল্পকার গোলেস্তান, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, পাহাড়, নদী, মরুভূমি ইত্যাদি পটভূমি কাব্যময় ভাষায় রূপ দান করেছেন। প্যারিস, ফ্রান্স, সিন নদী, পাহাড়, নির্ঝর ইত্যাদি নৈসর্গিক দৃশাবলি বাঙালি পাঠকের কাছে নতুনত্বের স্বাদ যুগিয়েছে। এই সব চিত্রকল্পের সবটাই যে কল্পনাপ্রসূত তা কিন্তু নয়; কিছু অভিজ্ঞতা জীবনের সঙ্গে যুক্ত, বাকিটা কল্পনা; অন্যের কাছে শোনা; অর্থাৎ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটান নজরুল। এসব কারণেই তাঁর পূর্বজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বা প্রথম

রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় গল্প ভুবনের তুলনায় যা অকিঞ্চিৎকর অবশ্যই, কিন্তু অকীর্তিকর নয়। তাঁর গল্পের প্রধান বিশেষত্ব বৈশ্বিক ও ঐশ্বর্যময় নৈসর্গিক পরিবেশ, তার রূপরঙ, সুর ছন্দ, নানা সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যময় উপাদান, প্রেম-পিপাসা, নজরুলীয় আবেগ, কাব্য ভাষা, নজরুলের একান্ত আপন বিস্ময়জাগা স্বভাব—যার জন্য বাংলা গল্প সাহিত্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্নাত হয়েছে। এসব নানা বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যে নজরুলের গল্প রবীন্দ্র ও কল্লোল বলয়ের বাইরে একটি স্বতন্ত্র দিগন্তের অভিযাত্রী।

চৌধুরীদের ছোটগল্পের সঙ্গে নজরুলের ছোটগল্পের স্বাতন্ত্র্য অনিবার্য। নজরুল বিষয় ও আঙ্গিকে নিজের বোহেমিয়ান অভিজ্ঞতার মিশেল দিয়ে কিছু ভিন্নধর্মী গল্প সৃষ্টি করেছেন। নজরুলের নিজের রচিত প্রথম দিকের গল্পগুলোর সঙ্গে 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের রাক্ষুসী, স্বামীহারা এবং শিউলিমালা গল্পগ্রন্থের গল্পগুলির তুলনা করলে দেখা যাবে তাঁর সৃষ্টিশীলতা অনেকটা বাঁক নিচ্ছে; তিনি পূর্বের তুলনায় অনেক পরিণত এবং অনন্য। গল্পকার নজরুল কবিতার মতোই গল্পে সর্বহারা মানুষের দুঃখময় জীবনের যন্ত্রণা, বিদ্রোহ-প্রতিবাদ, দেশপ্রেম-স্বদেশ চেতনা-সবকিছুই মূর্ত করে তুলেছেন। 'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি থেকে আমরা ভিন্ন নজরুলকে পাই। পূর্ব বাংলা থেকে রাঢ় বাংলা, মুসলমান জন-জীবন রূপায়ণে বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বাগদী-সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, গ্রাম জীবন, লোকবিশ্বাস সংস্কার, প্রাকৃতিক আবহ, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, টানাপোড়েন, ধর্মীয় আচার, কুসংস্কার, আঞ্চলিক ভাষা, অভিনব শব্দ প্রয়োগ এসবের সাপেক্ষে এইপর্বের গল্পগুলোতে নজরুল একান্ত নিজস্বতায় ভাস্বর হয়েছেন।

কবি নজরুল এবং গল্পকার নজরুল প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু কবিতার প্রতি স্বভাবজ ভালোবাসা, তাই গল্প নিয়ে বেশিদূর এগোননি। তাঁর কবি ব্যক্তিত্ব ও সংগীত-ব্যক্তিত্ব অতি অল্প সময়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। এই জনপ্রিয়তাকে সঙ্গী করে তিনি কিছু অনন্য সাধারণ গল্প উপহার দিয়েছেন বাংলার পাঠক সমাজকে। রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় গল্প ভুবনের তুলনায় যা অকিঞ্চিৎকর অবশ্যই, কিন্তু অকীর্তিকর নয়। তাঁর গল্পের প্রধান বিশেষত্ব বৈশ্বিক ও ঐশ্বর্যময় নৈসর্গিক পরিবেশ, তার রূপরঙ, সুর ছন্দ, নানা সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যময় উপাদান, প্রেম-পিপাসা, নজরুলীয় আবেগ, কাব্য ভাষা, নজরুলের একান্ত আপন বিস্ময়জাগা স্বভাব—যার জন্য বাংলা গল্প সাহিত্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্নাত হয়েছে। এসব নানা বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যে নজরুলের গল্প রবীন্দ্র ও কল্লোল বলয়ের বাইরে একটি স্বতন্ত্র দিগন্তের অভিযাত্রী।

এ যাবৎ কাল, নজরুল ইসলামের তিনটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। (১) ব্যথার দান (ফাল্গুন, ১৩২৮), (২) রিক্তের বেদন (পৌষ, ১৩৩১) (৩) শিউলিমালা (কার্তিক, ১৩৩৮)— এই তিনটি গল্পগ্রন্থে মোট ১৮ টি গল্প সংকলিত রয়েছে। আরো দুটি গল্প - 'বনের পাখিরা' ও 'হারা ছেলের চিঠি' গ্রন্থভুক্ত হয়নি। এই নিবন্ধে তিনটি গল্পগ্রন্থ থেকে মোট ৫টি গল্প নিয়ে আলোচনা করা হল। আলোচ্য 'রাক্ষুসী' এবং 'স্বামীহারা' রিক্তের বেদন থেকে এবং বাকি তিনটি গল্প : 'পদ্ম-গোখরো', 'জিনের বাদশা' ও 'অগ্নিগিরি' 'শিউলিমালা' থেকে চয়ন করা হয়েছে। কোনো-না কোনোভাবে গল্পগুলি আন্তঃ-সম্পর্কে সম্পৃক্ত। গল্পগুলির প্রেক্ষাপট এবং শিল্প-সৌন্দর্যের বিচার-বিশ্লেষণ বর্তমান নিবন্ধের অভীষ্ট।

রাক্ষুসী

'রাক্ষুসী' গল্পকার নজরুলের অনবদ্য সৃষ্টি। প্রারম্ভিক নাটকীয়তায় দ্বিধাহীন চমক সৃষ্টি যা ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তা এখানে রয়েছে। কথক নায়িকার উত্তম পুরুষের জবানীতে একটি উদ্ধৃতি চিহ্নের বৃত্তে গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। মাখন দি নাম্নী কোনো এক নারী শ্রোতার কাছে তার কৃত-কর্মের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। গল্পে নায়িকা বিন্দির মনের অন্তর দাহ, দ্বিধা, আগুন-জ্বলা যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট, সংসারের প্রতি মায়া-মমতা-ভালোবাসা,

সেই সংসারকে আগলে রাখার জন্য লড়াই তীক্ষ্ণ ভাষায় ফুটে উঠেছে। তাঁর এই বর্ণনা থেকে একটি নারীর মন-মনন এবং মনস্তত্ত্ব উন্মোচিত।

আদি কৌমের একটি জনগোষ্ঠীর নাম বাগদি। বিন্দি নামের গৃহবধূর 'রাক্ষুসী' হয়ে উঠার ইতিবৃত্ত, এই নৃ-গোষ্ঠীর জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন নৃ-গোষ্ঠীকে বেছে নেওয়ার মধ্যে নজরুলের স্বকীয়তা এবং রাঢ়ের জীবন অভিজ্ঞতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গল্প-চরিত্র আক্ষেপ করে বলেছে : "আমার সোয়ামী ছিল সাধাসিধে মানুষ, সে তো সোজা ছাড়া বাঁকা কিছু জানতা না। সে চাষ করত, কিরষাণি করত, আমি সারাটা দিন মাছ ধরে চাল কেঁড়ে ধান ভেনে আনতুম।" তিন তিনটি ছেলেমেয়ে পুষ্যি, ছা-পোষা মানুষ হলেও সংসার চলে যেতো কোনোরকমে হাতে-মুখে এক করে। আর যা-হোক সারা বছর খুব 'সচল বচল' করে খেয়েও ফুরাত না। বিন্দির স্বপ্ন ছিল, স্বামীর সেবা করে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে, নাতি নাতনিদের দেখে হাতের 'নোওয়া' অক্ষয় রেখে স্বর্গে যাবে। কিন্তু তা পোড়া বিধাতার অভিশাপে হতে পারল না। তার স্বামীর দোষের মধ্যে একটাই, তা হলো বড্ড মদ গিলত। পুরুষ মানুষের এ দোষ সে মেনেছিল, কিন্তু সেই মাতাল স্বামী রঘো বাগদির দু'তিনটে 'শ্যাঙ্গা করা' কড়ুই বাড়ির মেয়েটা তার স্বামীকে বশ করে নিল।' "ছুঁড়ি সোয়ামীর কখনো ঘর তো করেই নাই, মাঝ থেকে পাড়ার ছেলে, ছোকরাদের কাঁচা বুকে ঘুন ধরিয়ে দিচ্ছিল।" বিন্দি নানাভাবে চেষ্টা করল স্বামীকে ঘরমুখো করার জন্যে। কিন্তু পারল না। সেই মেয়ের সঙ্গে স্বামী বিয়ে করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। স্বামীর কাছ থেকে মার খেয়ে লেজে আঘাত খাওয়া সাপিনীর মতো ফোঁস করে উঠল বিন্দি। এখানে নারী মনের গভীর রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। প্রতিহিংসার আগুন তার মনে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। কোনো পুরুষ উন্মার্গগামী হলে, অবৈধ নারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে, সেই পুরুষের স্ত্রীর পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। বিন্দিও মেনে নিতে পারেনি। গভীর প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে ভয়ংকর নারী হয়ে ওঠে সে। ধারাল একটা দা নিয়ে বাঘিনীর মতো স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ধড় থেকে মণ্ডুকে ছিন্ন করে দেয় : "তার ঘাড়ে মস্ত একটা কোপ বসিয়ে দিতেই আমার হাতটা অবশ হয়ে এল।.... আমি তখন রক্তমুখো হয়ে উঠেছি। আমি আবার গিয়ে দুটো কোপ বসাতেই তার ঘাড় থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে গেল।" পাঠকের মনে তখন গভীর উৎকণ্ঠা ও বিস্ময় (Suspense & Surprise)। গল্পটির Climax এখানেই। তার অপরাধের বিচার হয়, জেল খাটতে হয়। তারপর ফিরে আসে ছেলের সংসারে। কিন্তু সমাজ তাকে সুস্থ থাকতে দিল না। আঘাতে আঘাতে, ব্যঙ্গ বিদ্রুপে তাকে জর্জরিত করে তুলল। সমাজের কাছে আজ সে 'রাক্ষুসী'! তার মনের দুঃসহ যন্ত্রণার কথা কেউ বুঝল না। ধীরে ধীরে তার মনস্তাত্ত্বিক দহন উন্মোচিত হয়েছে : "আমি তো ফের তেমনি করেই যেন কিছুই হয় নাই - ঘর পেতেছিলুম। রাত্তির দিন আমার কানের গোড়ায় আনাচে কানাচে, পথে, ঘাটে, কাজেকর্মে মজলিসে জৌলুসে আমার নামের 'রাক্ষুসী রাক্ষুসী' বলে কুৎসা ঘেন্না মুখ ব্যাঁকানি, চোখ রাঙানি এই সব মিলেই তো আমার মাথার মগজ বিগড়ে দিল।" তার সোজা কথা, দোষ তো তার নয়, দোষ তাদের যেসব ভালো মানুষেরা তাকে ক্ষেপিয়ে তুলল। সরাসরি, সমাজকে অভিযুক্ত করেছে সে। স্বামীকে হত্যা করে, হাজত বাস করে সে কি নিজেও শাস্তি পায়নি। তার জবানী থেকে জানা যায় : "আমি মানুষের দেওয়ার চেয়ে বড় শাস্তি পেয়েছিলুম নিজের মনের মাঝে। আমার জ্বালাটা যে সদা সর্বদা কি রকম মোচ্‌ড়ে মোচ্‌ড়ে উঠত তা কে বুঝত বল দেখি বুন ? নিজ হাতে কাটলেও সে তো ছিল আমার নিজের সোয়ামী।" এখানে থেমে থাকেনি মেয়েটি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গ বৈষম্য সচেতন এক বাগদি নারী। সে বলেছে : "আমি যদি ঐরকম একটা কান্ড বাধিয়ে বসতুম, আর যদি আমার সোয়ামী আমাকে কেটে ফেলত তাতে পুরুষেরা একটি কথাও বলত। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও বলত, হাঁ এরকম খারাপ মেয়ে মানুষের ঐ রকম মরা উচিত।" তার সমগ্র সত্তা জুড়ে একটা চাপা অভিমান। তার মন-মননে এমন ক্ষোভ গল্পটিকে একটা বহুমাত্রিক রূপ দিয়েছে। এই ক্ষোভ শুধু বিন্দির নয়, তার মতো সমগ্র নারী সমাজের। এই সমাজ তার সুখের সংসারকে লণ্ডভণ্ড করে দিল। মেয়েকে কেউ গ্রহণ করল না : "দেবতাদের শাপের মতো এসে আমাদের সব সুখশান্তি নষ্ট করে দিল! আমার ছেলেকে তারা এক ঘরে পতিত করলে, তাতেও তাদের সুখ মিটল না। নানান পেকারে—নানান ছুতোয় এই দুটো বছর ধরে কিনা কষ্টই দিয়েছে। এই গাঁয়ের লোক! দিদি, পথের কুকুরকেও এত ঘেন্না হেনস্থা করে না। এতে যে ভালো মানুষের মাথা বিগড়ে যায় আমার মতো শতেক খুয়ারি ডাইনি রাক্ষুসীর তো কথাই

নাই।" বিন্দি নিজের স্বামীকে নিগূঢ় করে নিজের করে রাখতে চেয়েছিল। এমন কি মৃত্যুর পরেও স্বামীকে একান্ত আপন করে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু তার সমাজ তাকে রাক্ষুসী তৈরি করে স্বামীকে কেড়ে নিচ্ছে তার থেকে।

গল্পকার সামাজিক নানা হেনস্থার চিত্র নানা আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। সমাজের এই অবহেলা তার মনের হতাশাকে লুকিয়ে রাখেনি। সে জেল খেটে এসেছে। দৈহিক কষ্ট তার কাছে কষ্ট মনে হয়নি। কিন্তু প্রত্যহ একটু একটু দহন যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থেকেছে; এই যন্ত্রণাই তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। রাঢ় বাংলার কথ্য ভাষাতে চরিত্রটি হয়েছে রক্তে-মাংসে জীবন্ত একটি নারী। এমন বৈশিষ্ট্যেই বিন্দি শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্ররূপে অঙ্কিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

গল্পের একেবারে শেষে অব্যক্ত মর্মন্তুদ বেদনাকে তুলে ধরা হয়েছে : "এখন তো তুই সব শুনলি দিদি, এখন বল, দোষ কার ? আর তুই হাতের মালসাটা আমার মাথায় ভেঙে আমার মাথাটা চৌচির করে দে - সব পাপের শান্তি হোক।" সত্যি সত্যি সে মনের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চেয়েছে, যা এমন চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটি জটিল প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক গল্প। 'দোষ কার?' সমাজের প্রতি উচ্চারিত এই প্রশ্নের সূত্রেই গল্পটি শৈল্পিক বন্ধনে বাধা পড়েছে।

স্বামীহারা

'স্বামীহারা' 'রাক্ষুসী'র মতোই আত্মকথন রীতিতে কথিত। সালিমা নাম্নী এক নারীর কাছে গল্পের প্রধান চরিত্র বেগম তার জীবনের দুঃখ-বেদনার কথা শুনিয়েছে। বিন্দির মতোই লোকে তাকে পাগল ভেবে দূর থেকে পালায়। গোটা গল্প জুড়ে বৈধব্য বিজড়িত জীবনের গভীর বেদনাতুর আর্তি, দীর্ঘশ্বাস মর্মরিত হয়েছে। গল্পটির শুরুতেই পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর বিপন্নতা বর্ণিত হয়েছে। সমাজে মেয়েরা পোড়া কপালি : "খোদা যেন মেয়েদের বিধবা করবার আগে মরণ দেন, তা না হলে তাদের বে হবার আগেই তারা যেন 'গোরে' যায়। তোর যদি মেয়ে হয়, সালিমা, তাহলে তখনি আঁতুর ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে দিস, বুঝলি? নইলে চিরকালীন আগুনের খাপরা বুকে নিয়ে কাল কাটাতে হবে।" — বেগম নিজের জীবন দিয়ে এ উপলব্ধি অর্জন করেছে বলেই এমন কথা বলতে পেরেছে।

সইমার বি.এ. পাশ ছেলে আজিজের সঙ্গে বিয়ে হয় বেগমের। সই-মা শাশুড়ি এবং আজিজ তাকে পরম আদরে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ঈর্ষাকাতর সমাজ তা ভালো মনে নেয়নি। সবাই হিংসার আগুনে পুড়তে থাকল : "আমার বিয়ের মতো এত বড় একটা অস্বাভাবিক কাণ্ডে গ্রামময় মহা হুলুস্থলু পড়ে গেল।" বাদশাজাদার সঙ্গে ঘুঁটে কুড়োনির বিয়ের মতোই। গ্রামের মেয়েরা অবাক বিস্ময়ে চেয়েছিল, "বাপরে বাপ, মেয়েটার কী পাঁচপুয়াল কপাল!" অনেকেই 'অভিসম্পাত' দিয়ে যেন তা ফলে যাবার অপেক্ষায় ছিল।

কলেরা আর বসন্ত জোট করে তার ছোট্ট গ্রামটা রাক্ষুসে হাঁ-নিয়ে গিলে ফেলল। মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকল। গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল। কিন্তু তার স্বামী গ্রাম থেকে পালাল না। মানুষের সেবায় দিনরাত এক করে দিল— ছুটে বেড়াতে লাগল কলেরা আর বসন্ত রোগী নিয়ে। শেষ পর্যন্ত নিজেই কলেরা আক্রান্ত হয়ে চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে।

দরদী গল্পকার নজরুল এমন একজন মানুষকে চিত্রিত করলেন যিনি সমাজের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিলেন। গল্পে পরশ্রীকাতর সমাজের মন-মননকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। সমাজ-মন এই সুযোগে তাদের বিবাহকালীন প্রতিহিংসা উগ্‌রে দিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর জন্য যেন স্ত্রী দায়ী। অলক্ষুণে স্ত্রী হিসেবে সব দায় তার ওপর চাপিয়ে তাকে চুলের মুঠি ধরে ঘর থেকে বার করে দিতে চেয়েছে সমাজপুরুষরা — "শয়তানী বেরো ঘর থেকে এখনি। তখনি বলেছিলুম, বনিয়াদী খানদানের উপর নাক চড়ান, এ সইবে কেন ? তোকে ঘরে এনে শেষে বংশে বাতি দিতে পর্যন্ত রইল না কেউ!" এখানে সমাজ মননকে ব্যঙ্গ-কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন গল্পকার। রাক্ষুসী আর স্বামীহারা দুটোই সমাজ-সচেতনতা মূলক গল্প। সংস্কারাচ্ছন্ন নিষ্ঠুর সমাজের কাছে গল্পটির এই নারীও যেন রাক্ষসী বলে প্রতিভাত হয়েছে।

গল্পটির পরতে পরতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। তার সুখের জীবন, শাশুড়ি ও স্বামীর অপরিমেয় ভালোবাসা যেন জীবন থেকে হারিয়ে না যায়, সেজন্যে সর্বদা শঙ্কিত থেকেছে সে। আবেগ মথিত হয়ে উঠেছে আখ্যান। এই অনুভূতির প্রেক্ষিতে নানা লোক-সংস্কার গল্পটিকে সেই সমকালীন সমাজ-বাস্তব চিত্রে অনন্য করে তুলেছে। গল্পের ঙ-অংশে বেগমের সশঙ্ক অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে : "সেদিন সকাল হতেই আমার ডান চোখটা নাচতে লাগল, বাড়ির পিছনে অশ্বত্থ গাছটায় একটা প্যাঁচা দিন দুপুরে তিন তিনবার ডেকে

উঠল, মাথার উপরে একটা কালো টিকটিকি অনবরত টিক টিক করে মনটাকে আরো অস্থির চঞ্চল করে তুলেছিল। আমার অদৃষ্টের সঙ্গে তাদের কি সংযোগ ছিল ?" স্বামীর বিদায় কালে : "আমাদের ঘরের আঙিনার নিমগাছটার পাতা ঝরে পড়ল ঝর ঝর করে। গোয়ালের গোরু দড়ি ছিঁড়ে গোঙাতে গোঙাতে ছুটল। দ্বারে কাকাতুয়াটি শুধু একবার একটা বিকট চিৎকার করে অসার হয়ে নীচের দিকে মুখ করে ঝুলে পড়ল। চারিদিকে মুমূর্ষুর একটা আহা আহা শব্দ রহিয়ে রহিয়ে উঠতে লাগল। সব ব্যেপে উঠতে লাগল শুধু একটা বীভৎস কান্নার রব।" এসব সংস্কার তৎকালীন সমাজের নারীমনে প্রোথিত ছিল। আজও এই বঙ্গ সমাজ সেগুলো থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এসবের মধ্যে দিয়ে গল্পটি বস্তবানুগ হয়ে উঠেছে।

কবি নজরুলের মতোই গল্পকার নজরুলও আবেগে বেগবান। গল্পের ভাষা, তাই, আবেগ মথিত। কোথাও কোথাও ঐশ্বরিক তাত্ত্বিক কথা, দর্শনও ব্যক্ত হয়েছে। গল্পের শেষাংশে সর্বস্ব হারিয়ে মৃত্যু পথযাত্রী নায়িকার বক্তব্য অত্যন্ত আবেগপূর্ণতার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। এটা না হলেও গল্পের কোনো ক্ষতি হত না। তবে তা সত্ত্বেও, কাহিনির একমুখিনতা রক্ষিত হয়েছে। কাহিনির গন্তব্যে পৌঁছতে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি পাঠকের দিক থেকে।

জিনের বাদশা

শিউলিমালা-র প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প জিনের বাদশা। 'আরিয়েল খাঁ' নদী-পাড়ে একটি ছোট্ট গ্রাম মোহনপুর। সেই গ্রামের চুন্নু ব্যাপারী একজন চাষা। সেই চাষার ছেলে আল্লা রাখা। এই নায়ক চরিত্র ভারী অদ্ভুত; বাবরি চুল, অদ্ভুত চুলের ছাঁট, কেশ রঞ্জনময় চুলের সিঁথি। তাই তার নাম হয়ে যায়, 'কেশরঞ্জন বাবু'। "নায়কের মতোই দুঃশীল, দুঃসাহসী, দুঁদে ছেলে সে।"

এই আল্লারাখা মাতব্বর নারদ আলির মেয়ে চান্দ ভানু বা চান ভানুর প্রতি প্রেমে পড়ে তাকে লাভ করবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। পুঁথির চরিত্র দ্বারা গল্পের নায়ক গভীরভাবে প্রভাবিত : "আল্লারাখার সোনাভানের পুঁথি পড়তে পড়তে মনে হল, চান ভানু যে সোনাভান বিবি এবং সে গাজি হানিফা।" .... "হানিফার আওয়াজ বিবি শুনিল যখন,/ নাসতা করিয়া নিল থোড়া আশি মন।" সেকালের মুসলিম সমাজে 'সোনাভানের পুথি' ছিল বহুল প্রচলিত। যুবক-যুবতীরা পুথির চরিত্রদের সঙ্গে তুলনায় এনে নিজেদের নায়ক-নায়িকা ভাবত। এ গল্পের নায়ক-নায়িকার মতো কাল্পনিক পুথির অনুষঙ্গে কাহিনির সূত্রপাত। ফলে, গল্পটিতে অতিকথন ও অতিরঞ্জন স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হয়েছে। জিনের অনুষঙ্গে অলৌকিক নানা ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় চমকপ্রদ নাটকীয়তা ও হাস্যকৌতুকে আখ্যানটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

যৌবনের 'ফ্রন্টিয়ার' ক্রস করলেও আল্লারাখা কোনোদিন মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেনি। সেই আল্লারাখা চান ভানুকে পাওয়ার বাসনায় জিনের বাদশা সেজে চান ভানু, চান ভানুদের বাড়ি, এমন কি গোটা গ্রামকে ভীত-আতঙ্কিত করে তুলল। চান ভানুর মনেও আল্লারাখার প্রতি প্রেমের বান ডাক দিল : "পঞ্চশরের ঠাকুরটির ঘরে কেউটে সাপের মতোই হয়তো তীব্র বিষ মাখানো থাকে। শর বিধঁবা মাত্র এ বিষ সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর ছেয়ে মাথায় গিয়ে ওঠে! নইলে এ কয়েক ঘন্টার মধ্যে চানের অবস্থা এমন সঙিন হয়ে উঠত না। ওকে ভুলতেও পারে না, মনে করতেও শরীর রাগের জ্বালায় তপ্ত হয়ে ওঠে।" সোনা ভানের চম্বুক-স্পর্শ লাভের জন্য বুকের রক্ত দেখিয়ে সাপের দংশন খাওয়ার অভিনয় করেছে এবং সফল হয়েছে আল্লারাখা। চান ভানু তার বুকের ক্ষত-স্থান চুষে খানিকটা রক্তও বের করে ফেলে। এ সাপ তো আসলে সাপিনী চানভানুই : "চানের মনে হতে লাগল, সাপে আল্লা রাখাকে কামড়ায় নি, কামড়েছে তাকে।"

চান ভানুর বিয়ে ঠিক হয়ে যায় অন্যত্র। আল্লারাখা তার ডানপিঠে দলবল নিয়ে জিন সেজে ভয় দেখিয়ে বিয়ে ভাঙার চেষ্টা করল। চান ভানুর বাবা নারদ আলির কথায় : "আল্লারে আল্লা !.... আমি বারইয়া দেহি তাল গাছের লাহান একডা বুইড়্যা মাথায় পগগ বাঁইন্দ্যা খারাইয়া আছে। দশ-হাত লম্বা তার দাড়ি। আল্লারে আল্লা ! ও জিনের বাদশা আইছিল আমাগো বারিত !" কৌতুকভাষ্যে গল্পটি জীবন্ত। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরে ভাষা প্রতিবেশকে আরও হাস্যরসে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তারপরেও চান ভানুর অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আল্লা রাখা রণে ভঙ্গ দেয়। চান ভানু তাকে ভালোবাসে। সেই ভালোবাসার পরশে 'হিংসা দেশ লোভ ক্ষুধা' সমস্ত ভুলে কৃষাণ জীবন বরণ করে নিল সে। বাবরি চুল ছেঁটো, কাঁধে একখানি গামছা, হাতে পাঁচালি, কাঁধে লাঙ্গলধারী একজন কৃষক। আল্লা রাখার এই কৃষাণ মূর্তি দেখে চাঁদ ভানু ওরফে

সোনাভানের চোখ প্রভাতের মেঘলা আকাশের মতো বাষ্পাকুল হয়ে উঠল। উপসংহারের শেষ দুটি পংক্তি গল্পের নামকরণকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে : "সে দৌড়ে গিয়ে আল্লারাখার পায়ের কাছে পড়ে কেঁদে উঠল, 'কে তোমারে এমনটা করল?" আল্লারাখা শান্ত হাসি হেসে বলে উঠল - 'জিনের বাদশা।'

গল্পটির সমাপ্তি নিয়ে পাঠকের মনে একটা অতৃপ্তি রয়ে গেল। Humour শেষ পর্যন্ত Wit-এ পরিণত হয়। নায়কের মতো কৌশল, এতো কেরামতি সবই ব্যর্থ! পরিণতি একেবারে বিয়োগান্তক! এক্ষেত্রে বলা ভালো গল্পকার আল্লারাখা চরিত্রের সুন্দর উত্তরণ ঘটিয়ে পাঠকের অতৃপ্তিকে জাগিয়ে রাখল। আর পাঠকের অন্তরের অতৃপ্তিই গল্পের পরিসমাপ্তির উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য।

অগ্নিগিরি

'অগ্নিগিরি' নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যে গিরি একটা সময় পর্যন্ত ঘুমন্ত ছিল, শত আঘাতে জেগে ওঠেনি; কিশোরী নূর জাহানের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে সেই অগ্নিগিরি সবুর আখন্দের ঘুমন্ত সত্তার বিস্ফোরণ ঘটে। সবুর সহজ-সরল এক গ্রাম্য যুবক : 'সবুর আখন্দ। নামেও সবুর কাজেও সবুর! ... তার চোখ দুটি যেন দুটি ভীরু পাখি। একবার চেয়েই অমনি নত হয়।" পাড়ার রুস্তমের দুষ্টু দল তাকে খ্যাপালেও, মানসিক অত্যাচার করলেও কোনোদিন প্রতিবাদ করেনি সে। নীরবে সমস্ত কিছুই সহ্য করেছে। নির্যাতনের পদ্ধতিতে, ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ক্ষেত্রে ছড়ার সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবহার পাঠককে মুগ্ধ করে—"প্যাঁচা, একবার খ্যাচখ্যাচাও/গর্ত থাইক্যা কুচকি দাও/মুচকি হাইস্যা কও কথা/প্যাচারে মোর খাও মাথা!" কিংবা " প্যাচা মিয়াঁ কেতাব পড়ে/হাঁড়ি নড়ে দাড়ি নড়ে!" এই ছড়া ব্যবহারে Wit এবং Satire রসে জীবন্ত হয়েছে আখ্যান।

নসিব মিঁয়ার একমাত্র সন্তান আদুরে নূরজাহান। সবুর নূরজাহানকে উর্দু পড়ায়। তিন বছর সবুর নসিব মিঁয়ার বাড়িতে আছে। কিন্তু কোনোদিন সে নূরজাহানের দিকে একটিবারও চোখ তুলে তাকায়নি। নূরজাহান কিন্তু নিরীহ সবুরকে ভালোবাসে : "নির্দোষ, নির্বিরোধ নিরীহ সবুরের উপর রস্তুমি দল ব্যঙ্গ বিদ্রুপের কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, তখন আর থাকতে পারে না।" নূরজাহানের সমস্ত মমতা, সমস্ত করুণা, সর্বদা যে সবুরকে ঘিরে রাখে, সেই নূরজাহান একদিন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল : "আপনি বেডা না? আপনারে লইয়া ইবলিশা পোলাপান যা তা কইব আর আপনি ইইন্যা ল্যাজ গুডাইয়া চইলা আইবেন? আল্লায় আপনারে হাত-মুখ দিছে না।" সবুরের প্রতি তার ভালোবাসা এবং প্রেম-জনিত যে যন্ত্রণা তারই আর্তি এই উক্তি। পূর্ববঙ্গের এই ভাষা ব্যবহারে নূরজাহানের যন্ত্রণা-কাতর মনের প্রকাশ হয়েছে অনবদ্য। এই তিরস্কারে নিরীহ সবুরের পৌরুষ আগ্নেয়গিরির মতো ভয়ংকর রূপে আত্মপ্রকাশ করল। মৌনী পাহাড় কথা কয় না, কিন্তু সে যেদিন কথা কয়, সেদিন সে হয়ে ওঠে অগ্নিগিরি। এজন্য, কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, প্রেমই যেন মূল, ঘটনার নিয়ন্ত্রক। পাড়ার ইবলিশ রস্তুমের দল যখন খ্যাপাতে ছুটে এলো, তখন আহত সবুর সিংহের মতো সেই দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে এতোটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, রস্তুমের দলের আমীর নামে একটি ছেলের অকালে প্রাণ গেল। গল্পের এটাই ছিল চরম মুহূর্ত (Climax)।

সবুরের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য থানা থেকে পুলিশ এলো, কেস কোর্টে গেল। সবুরের সাত বছরের জেল হল। সবুর ও নূরজাহানের প্রেম সাত বছর পর্যন্ত অতৃপ্ত চিত্তে অপেক্ষা করতে থাকল। তাদের এই মনস্তাত্ত্বিক দহন লেখক সুন্দর ভাবে তুলে

নূরজাহান কিন্তু নিরীহ সবুরকে ভালোবাসে : "নির্দোষ, নির্বিরোধ নিরীহ সবুরের উপর রস্তুমি দল ব্যঙ্গ বিদ্রুপের কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, তখন আর থাকতে পারে না।" নূরজাহানের সমস্ত মমতা, সমস্ত করুণা, সর্বদা যে সবুরকে ঘিরে রাখে, সেই নূরজাহান একদিন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল : "আপনি বেডা না? আপনারে লইয়া ইবলিশা পোলাপান যা তা কইব আর আপনি ইইন্যা ল্যাজ গুডাইয়া চইলা আইবেন? আল্লায় আপনারে হাত-মুখ দিছে না।" সবুরের প্রতি তার ভালোবাসা এবং প্রেম-জনিত যে যন্ত্রণা তারই আর্তি এই উক্তি।

ধরেছেন। এই ঘটনা ঘটে যাবার পর সবুর ও নূরজাহানের সম্পর্ক নিয়ে নানা রটনা পল্লবিত হতে থাকল। যা গ্রাম বাংলার চিরায়ত চিত্র। নিষ্পাপ চরিত্র দুটি নিয়ে "দেশময় টি টি পড়ে গেল।" নূরজাহান আর নসিব মিঁয়া একেবারে মাটিতে মিশে গেল। আমাদের এরকম কুৎসা রটানোর লোকের অভাব হয়নি। সুতরাং, যে কলঙ্ক রটল, তাতে আর এদেশে থাকা যায় না। মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা পবিত্র মক্কা ভূমি। সেখানে গিয়ে এই কটা বছর আত্মগোপন করে কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। এটি মুসলমান জীবনের সমাজ বাস্তবতার অনবদ্য চিত্র। এই পলায়নপরতাই গল্পটির দুর্বল অংশ।

গল্পটির শেষ ৪ নং অংশ কেমন যেন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। এই আবেগময় গীতিধর্মিতা গল্পটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। যাইহোক, সবুরের এই প্রতিবাদ, ক্ষোভ যেন উন্মার্গগামী সমাজের বিরুদ্ধেই প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের চন্দ্ররা চরিত্রের মতো। সবুরের চরিত্রের এই দৃঢ়তায় আখ্যানে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। এখানেই গল্পটি সার্থক।

পদ্ম-গোখরো

পদ্ম-গোখরো গল্পটির শুরুটা চমকপ্রদ। নাটকীয়ভাবে মির সাহেবদের উত্থানের প্রসঙ্গ টেনেই শুরু হয়েছে গল্প। হৃত অতীত ঐতিহ্য আবার ফিরে আসছে : "গ্রামময় এই কথা পল্লবিত হইয়া প্রচার হইয়া পড়িল যে, মির সাহেবদের সৌভাগ্য লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।" এর গোপন চাবি 'পয়' হলো নববধূ জোহরা। গুপ্তধনের দেবী যেন নববধূ। তার জিয়ন কাঠির স্পর্শেই যক্ষের ধন-সম্পদ লাভ করছে মির পরিবার।

এ ধরনের গ্রামীণ লোককথা ও শ্রুতিকথন আজও প্রচলিত আছে। গল্পগুলি অবিশ্বাস্য অথচ বাস্তব হয়ে বেঁচে আছে। আমার গ্রামে এক হাজি কৃষাণ জমিতে চাষ করতে গিয়ে তিন কলস রৌপ্য মুদ্রা পায়। সেই তিন ঘড়া রৌপ্য মুদ্রা হাজি সাহেব বাড়িতে নিয়ে এসে যত্ন করে রেখে দেন। তারপরই কৃষাণটি মারা যায়। শুধু তাই নয়; জিনেরা হাজির কয়েক পুরুষকে ভয়-আতঙ্কিত করে জ্বালাতন করত। পদ্ম-গোখরো অনেকটাই এজাতীয় গল্প। এখানে শুধু জিনের পরিবর্তে সাপের কথা এসেছে। জিন জাতি বিভিন্ন প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে। অতিপ্রাকৃত এবং অলৌকিকতা গল্পটিকে অবাস্তব করে তুলেছে।

বউ-মার পথেই যে ধনলক্ষ্মী মির বাড়িতে পদার্পণ করেছে, কথাটা একেবারে অসত্য নয়। একদিন জোহরা শ্বশুর বাড়ির জীর্ণ দেওয়ালের ফাটলে আঘাত করলে সেখান থেকে এক কলস বাদশাহি আশরফি উদ্ধার হয়। তবে সেই কলস আগলে ছিল দুটো পদ্ম গোখরো। বাস্তু সাপও পদ্ম-গোখরো, তাই সাপ দুটোকে মারা হয়নি। জোহরার সেবা যত্নে পদ্ম গোখরো দুটো তার খুব অনুরক্ত হয়ে পড়ে। বাড়িময় ওদের অবাধ বিচরণ। গভীর মাতৃস্নেহে জোহরা ওদের দুধ খেতে দেয়, ভালোবাসে। রাতে জোহরার বুকের কাছে এসে ঘুমায়। বিয়ের এক বছরের মধ্যে জোহরার যমজ - দুটি-সন্তান আতুরে মারা যায়। ক্ষুধাতুর মাতৃচিত্ত এই সর্পশিশু দুটিকে নিয়ে যেন তৃপ্তি লাভ করে।

এদিকে জোহরার স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি—সকলে মৃত্যু আতঙ্কে বিচলিত হয়ে ওঠে। আসিফের জীবন দুই সর্প বিষ জর্জর করে তুলল। স্ত্রীর মোহ ত্যাগ করে কলকাতায় পালিয়ে গেল সে। জোহরাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেও সমস্যা মেটে না। সন্তান শোকার্ত মাতার ন্যায় জোহরা বিছানায় আশ্রয় নিল। এদিকে পদ্ম গোখরোরাও মাতৃহারা সন্তানের মতো দুঃখে-শোকে দুর্বল হয়ে পড়ল। জোহরা স্বপ্নে দেখে মৃত সন্তানেরা বলছে : "মাগো বড় খিদে, কতদিন আমাদের দুধ দাও নি। আমরা কবরে শুয়ে আছি, আর উঠতে পারি না।" জোহরা পাগলের মতো পারিবারিক গোরস্থানে গিয়ে 'খোকা, খোকা' বলে মুর্চ্ছিতা হয়ে গেল। জোহরা জেগে ওঠে দেখে তার বুকে কুণ্ডলি পাকিয়ে রয়েছে সেই পদ্ম গোখরো। পরম আদরে জোহরা ওদের দুধ পান করাল। শাশুড়ির জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলেছে : "ওরা বালাই হবে কেন মা ? ওরা যে আমার খোকা!" তবে এসব কিছুর পরেও গল্পটিতে জোহরার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অব্যক্তই থেকে গেছে।

মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে গভীর ভালোবাসা-সম্পর্ক নিয়ে পৃথিবীর নানা ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও অনেক গল্প লেখা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', প্রভাত কুমারের 'আদরিণী', তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' শরদিন্দুর 'বাঘিনী', হাসান

আজিজুল হকের 'সাপ' প্রভৃতি। প্রত্যেকটি গল্প স্বতন্ত্র অ্যালেগরি বা সিম্বল সৃষ্টি করেছে স্বকীয় ক্ষেত্রে। আলোচ্য গল্পে সন্তানহারা মায়ের মাতৃত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।

গল্পটির আখ্যান দুর্বলতা পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। আরিফের শ্বশুর-শাশুড়ির মেয়ের গয়না চুরি, জামাই আরিফকে বিষপান করানো, হজব্রতে যাত্রা ইত্যাদি অতিরিক্ত বলে মনে হয়েছে। এই উপ-ঘটনা না সৃষ্টি হলেও গল্পের কিছু ক্ষতি হত না। সংহতির পরিবর্তে এই কাহিনি আখ্যানকে ভারাক্রান্ত করেছে। একমাত্র গল্পটির শেষ পংক্তি বিশেষ তাৎপর্যময় : "ভোর হতেই না হইতেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মির সাবেহদের সোনার বউ একজোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।" রটনা প্রধান গ্রাম জীবন। এ পংক্তিটির ব্যঞ্জনা কি এরকম ভাবা যেতে পারে যে, গ্রামীণ মানুষ মিরবাড়ির বউয়ের প্রতি পুরোনো বিদ্বেষ থেকে এরকম একটা ভয়ংকর বিষয়কে রটিয়েছে। যা হোক, গল্পটির আখ্যান রয়েছে মনস্তত্ব ও প্রতীকি ব্যঞ্জনা — সব মিলিয়ে বাংলা গল্পের অঙ্গনে এ এক অধিবাস্তব উপস্থাপনা।

উপসংহারে একথা বলা যায়, নজরুলের গল্পগুলির আঙ্গিক, আখ্যান গঠন ও চরিত্র চিত্রণ তুলনামূলকভাবে ব্যতিক্রমী। এই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে শিল্পসৌন্দর্যের বিঘ্ন ঘটেছে। মূলত, গল্পগুলিতে শিল্প-সার্থকতার অভাব ও লিরিক ধর্মীতার প্রাধান্য থাকায় ভাষা হয়েছে আবেগপূর্ণ। সমালোচকের কথায়, "এটুকু বাদ দিলে নজরুলের আবেগ ও কথ্য ভাষার ভিতর জীবন উপলব্ধির গভীরতা তুলনা রহিত। গল্পভাষা যে কবিতার মতোই কাব্যালংকারময় হতে পারে এ তো এক উজ্জ্বল উদাহরণ, নজরুল স্বকীয়তা।"

আমাদের আলোচ্য পাঁচটি গল্প বীরভূমের রাঢ় অঞ্চল, ময়মনসিংহ অর্থাৎ পূর্ব বাংলার গ্রামজীবনের পটভূমিকায় রচিত। এগুলোতে চিত্রিত তাঁর অনেক গল্পই সংহত, সংযত ও বিষয় উপযোগী। যেমন, রাক্ষুসী ও স্বামীহারা। ভাষা ব্যবহারে নজরুল ছিলেন স্বচ্ছন্দ। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, "নজরুল কেবল তার পরিচিত ও জানা চুরুলিয়া অঞ্চলের বাগ্দীদের মুখের ভাষা ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হননি, সমাজের নিচের তলার শহর ও গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন মুখের ভাষা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিষ্ট কথ্যভাষা আর খ্রিস্টান মিশনারীদের কৃত্রিম বাংলা ভাষা সমান নৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন।" (কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন) বস্তুত বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি—"সাহিত্যিক সাধু বা চল্তি কিংবা কথ্য চলতি বা আঞ্চলিক — নজরুলের কথাসাহিত্য সমানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গদ্যের ক্ষেত্রে নজরুলের গ্রহণ ও শোষণ ক্ষমতা ছিল গভীর ও ব্যাপক, সেখানে তার কোন সংশয় ছিল না, কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপের বাস্তব রূপায়নের জন্যে তিনি অসংকোচে যে কোনো রীতি ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন।" (সুদেষ্ণা চক্রবর্তী—নজরুলের গল্প উপন্যাস। বহুমাত্রিক নজরুল - হাসান হাফিজ সম্পাদিত) আলোচ্য পদ্ম-গোখরো গল্পটি সাধুরীতিতে লেখা। তিনি যেমন রাঢ় বাংলার বাগদীদের ভাষা ব্যবহার করেছেন, তেমনি পূর্ববঙ্গ তথা ফরিদপুর জেলার চাষী মুসলমানদের ভাষা ও পূর্ব বঙ্গজ শব্দ ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়েছেন। গল্পগুলির শিল্পসৌন্দর্য, গঠনশৈলী ও ভাষারীতি পাঠককে মুগ্ধ করে।

গল্পকার গল্পের পটভূমির অনুযায়ী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে নারী চরিত্র সৃষ্টিতে অসামান্যতার ছাপ রেখেছেন। তাঁর গল্পগুলি নারী প্রধান। এমন কি প্রেমের গল্পগুলিতেও নারীরাই উজ্জ্বল। আমাদের আলোচ্য গল্পগুলির নারী চরিত্র বিন্দি (রাক্ষুসী), বেগম (স্বামী হারা) চান্দ ভানু (জিনের বাদশা) নূরজাহান (অগ্নিগিরি) ও জোহরা (পদ্ম-গোখরো) --- প্রত্যেকটি চরিত্রই রক্তে-মাংসে জীবন্ত, স্বকীয়তায় বিশিষ্ট। প্রত্যেকটি গল্পে কাহিনির ভরকেন্দ্রে রয়েছে এই নারীরা। তাদেরকে নিয়ে আখ্যান গড়ে উঠেছে।

গল্পের আঙ্গিক, প্লট ও চরিত্র নির্মাণে নজরুলের সীমাবদ্ধতা ছিল, ছোটগল্পের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যে সব গল্পই সার্থকতা লাভ করেছে, এমন বলা যাবে না। সুদেষ্ণা চক্রবর্তী লিখেছেন, "নজরুলের গল্পগুলি ছোটগল্পের আঙ্গিক অনুসারে খুব পরিণত বা সুংসহত নয়। আবেগের বাড়াবাড়ি কোথাও স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত করেছে।' তারপরেও বলতে হবে, 'রাক্ষুসী'র মতো গল্প কি পাঠক খুব সহজে ভুলে যেতে পারবে ? ছোটগল্প নাই বা হলো, গল্প হিসেবে নজরুলের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে চির অম্লান থাকবে, এতে কোনো সংশয় নেই।

প্রসঙ্গ : নজরুলের শিউলি মালা

সাইফুল্লা

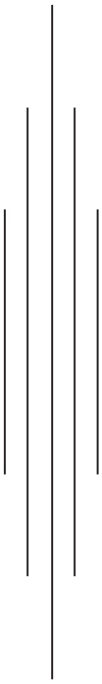

নজরুলের শিউলিমালা গল্প সংকলন। পদ্ম-গোখরো, জিনের বাদশা, অগ্নিগিরি ও শিউলিমালা নামের চারটি গল্প সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি কার্তিক ১৩৩৮, অক্টোবর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল অনুসারে এটি নজরুলের তৃতীয় গল্পগ্রন্থ। এক্ষেত্রে শিউলিমালা-র আগে রয়েছে যথাক্রমে বাঁধনহারা এবং রিক্তের বেদন।

প্রকাশক গোপালচন্দ্র মজুমদার এর ব্যবস্থাপনায় ডি এম লাইব্রেরি (৬১, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা) থেকে প্রকাশিত শিউলিমালা-য় মুদ্রাকর হিসাবে শশিভূষণ পাল (মেটকাফ প্রেস, কলকাতা) এর নাম উল্লেখিত হয়েছিল। ২+১১২ পৃষ্ঠা সংখ্যা সমন্বিত বইটির মূল্য ছিল এক টাকা। যতদূর জানা যাচ্ছে নজরুলের জীবৎকালে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বা মুদ্রণ হয়নি। পরবর্তীকালেও শিউলিমালা-র কোনো মুদ্রণ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে এখানে সংকলিত রচনাগুলির কোনো কোনোটি, বিশেষত পদ্ম-গোখরো নজরুল-সৃষ্টি কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

শিউলিমালা-য় সংকলিত চারটি গল্পের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ পদ্ম-গোখরো প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল দুন্দুভি পত্রিকায়। অন্য রচনাগুলির মধ্যে জিনের বাদশা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭; অগ্নিগিরি, আষাঢ় ১৩৩৭ এবং শিউলিমালা, শ্রাবণ ১৩৩৭ সংখ্যা সওগাত পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। প্রকাশকালের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নেই; এ থেকে অনুমান করা চলে গল্পগুলির রচনাকালের মধ্যেও তেমন ব্যবধান ছিল না। বলা যায়, এক বিশেষ সময়ের বিশেষ ভাবনাকে বাণীরূপ দেওয়ার জন্য নজরুল এগুলি রচনা করে থাকবেন।

নজরুলের লেখালেখির যে ইতিহাস বিধৃত রয়েছে তা থেকে প্রতিপন্ন হয়, মূলত কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও গদ্য রচনার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। বিশেষত লেখক হিসাবে তিনি যেখানে যাত্রা শুরু করেছিলেন গল্প রচনার মধ্যে দিয়ে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা-য় প্রকাশিত বাউণ্ডেলের আত্মকথা নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা। সেদিক থেকে দেখলে বলার

অপেক্ষা রাখে না, যে শিউলিমালা এবং এই গ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত রচনা সমূহ নজরুলের সৃষ্টির অঙ্গনে কোনো অকস্মিক বা ব্যতিক্রমী উপস্থাপন নয়। এরও একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। কাব্য-কবিতা রচনার পাশাপাশি নজরুল তাঁর গদ্য রচনার ধারাকেও নিরবচ্ছিন্ন রেখেছিলেন এবং সেই ধারায় গল্প বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

সাহিত্যের নানা সংরূপের মধ্যে গল্প অন্যতম; এবং গল্পেরও রয়েছে রকমফের—ছোটোগল্প, বড়োগল্প, গল্প, অণুগল্প প্রভৃতি। গল্পের এইসব রকমফেরের নিরিখে দেখলে দেখা যায়, অণুগল্প বলতে যা বোঝায় নজরুল কখনো তা রচনা করেননি। তাঁর সময়ে অণুগল্পের তেমন প্রচার প্রসার ছিল না। অণুগল্পের কথা বাদ দিলে গল্পের অন্য সব সংরূপে নজরুলের পদচারণা মোটের উপর স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর কোনো কোনো গল্প যেমন আকারে প্রকারে আক্ষরিক অর্থেই বড় গল্প তেমনি একান্ত অন্তরঙ্গ অনুষঙ্গের সাপেক্ষেও এক একটি নজরুল-গদ্যকে ছোটোগল্পের শ্রেণির্ভুক্ত করা যায়। অর্থাৎ মুখ্যত কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত হলেও গল্পকার নজরুলও আলাদা করে পাঠকের আকর্ষণ দাবি করতে পারেন। তাঁর সৃষ্ট গল্পে যেমন প্রাকরণিক বৈচিত্র্য রয়েছে তেমনি রয়েছে বিষয় ও ভাবের নিজস্বতা এবং গভীরতা। শিউলিমালা-র গল্পগুলি যেমন।

২

মানুষ ও মানবেতর প্রাণির সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত চিরকালীন সত্য। সেই প্রথম দিন থেকে, যখন অপরাপর মানবেতর প্রাণীর মতো করেই মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে অবস্থান করতো সেই দিন থেকে মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে তার কখনো দ্বন্দ্বের, কখনো সৌর্হাদ্যের সম্পর্ক বজায় আছে। যে দুরন্ত হাতির আঘাতে ধ্বস্ত হয়েছে জীবন ও সম্পদ সেই হাতিই হয়তো বা বন্ধু রূপে সম্পন্ন করে দিয়েছে হাজারও কাজ। মানুষের সঙ্গে মানবেতর প্রাণীর সম্পর্কের এই যে ঘাত প্রতিঘাত তা প্রায়শ ছায়াপাত করেছে শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে। দেশে-বিদেশে এমন অনেক গল্প, উপন্যাস লেখা হয়েছে যেখানে মানবেতর প্রাণীকেই অধিষ্ঠিত করা হয়েছে নায়ক বা প্রায় নায়কের আসনে। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মহেশ বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদরিণী যেমন।

মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মানবিক সম্পর্ক বিষয়ক বাংলা গল্পের এই যে বহমান ধারা তাকে বিশেষভাবে পুষ্ট করেছে নজরুলের পদ্ম-গোখরো। রসুলপুরের মীর সাহেবদের বাড়িতে বধূ হয়ে আসা জোহরাকে মায়ের মতো করে ভালোবেসেছে দুটি পদ্ম-গোখরো। জোহরাও সন্তান স্নেহে সিক্ত করেছে ওই দুই সর্প সন্তানকে। তাদের ভালোবাসাবাসি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে জোহরা নিজে হাতে বেড়ে না দিলে পদ্ম-গোখরো খায় না; মায়ের বিছানায় শয়ন না করলে তাদের ঠিক মতো ঘুম হয় না। জোহরা ও তার সর্প-সন্তানদের এই ব্যাপার স্যাপার ঠিক হজম করতে পারে না শ্বশুর বাড়ির লোকজন। তারা তাই পরিকল্পনা করে জোহরাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর দীর্ঘ বিরহ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় জোহরা ও তার সন্তান। তারপর একদিন যখন এ বিরহ-যন্ত্রণায় সমাপণ-সম্ভাবনা তৈরি হয় সেদিন ঘটনাচক্রে বেজে ওঠে চির বিচ্ছেদের বাজনা। মৃত্যুর দুয়ারে পা রাখতে বাধ্য হয় জোহরা ও তার সর্প সন্তানরা।

ট্রাজিক পরিণতি সম্পন্ন এই যে পদ্ম-গোখরো তা এর নির্মাণ, গল্পকারের জীবনবোধ, সমাজবাস্তবতার গভীরতা, ভাবের প্রসারতা ইত্যাদি নানা কারণে স্মরণীয়। একদা সাপকে ঘিরে আমাদের সামাজিক জীবনে বিশ্বাস-সংস্কারের যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তা কমবেশি অটুট আছে অদ্যাবধি। এখনও আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি পুরনো বনেদি পরিবারে এমন অনেক বাস্তু সাপ থাকে যারা পুরনো ধনসম্পদকে আজও আগলে বসে রয়েছে। উপযুক্ত সেবা পরায়ণতার দ্বারা বাস্তুসাপকে সন্তুষ্ট করতে পারলে হদিশ মিলতে পারে গোপন রত্ন ভাণ্ডারের। পদ্ম-গোখরো তে প্রথমেই আমাদের এই চিরায়ত বিশ্বাসের পটভূমিতে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে গল্পের কাহিনিকে। অতঃপর ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চে পর্দাপণ করেছে প্রধান কুশীলবরা, অর্থাৎ জোহরা ও তার সর্প-সন্তান দ্বয়। এক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরে সামান্য একটু তুলির টানে গল্পকার জোহরা ও পদ্ম-গোখরোদের সম্পর্কের পাপড়িগুলিকে যেভাবে উন্মোচিত করেছেন তা অনন্য সুন্দর। বিশেষত তাদের বিরহী মনের চিত্রণ : "জোহরা উন্মত্তের মতো চিৎকার করিয়া উঠিল, 'খোকা, আমার খোকা, তোরা এসেছিল, তোদের মাকে মনে পড়ল?' জোহরা আবেগে সাপ দুইটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, সর্প দুইটিও মালার মতো তাহার কণ্ঠ-বাহু জড়াইয়া ধরিল।"

মানবী মা ও সর্প সন্তানের অনিন্দ্যসুন্দর সম্পর্ক-কথার পাশাপাশি পদ্ম-গোখরো-তে গল্প তার ডালপালা বিস্তার করেছে আরও নানা দিকে। সমাজবাস্তবতার গভীরতা ও ব্যাপ্তি গল্পের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক। আরিফদের পারিবারিক জীবন, আরিফ ও জোহরার দাম্পত্য মধুরতা, জোহরার পিতা-মাতার কুৎসিত জীবনবোধ, স্বল্প পরিসরে এসবের যে বিশ্বস্ত উপস্থাপন রয়েছে তা খুবই উপভোগ্য। মেয়ের গহনা চুরি করেছে জোহরার বাবা-মা। এক্ষেত্রে চুরি করার যে পথ তারা অবলম্বন করেছে তা লোমহর্ষক। উন্মুক্ত অস্ত্র জামাই এর বুকের উপর ধরে আছে শ্বশুর মহাশয়, ওদিকে শাশুড়ি ব্যস্ত রয়েছে গহনার বাক্স নিয়ে। বিষয়টি আমাদের সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন থেকে যায়! সাহিত্যক্ষেত্রে একথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে, অবিশ্বাস্য বাস্তবতার চেয়ে বিশ্বাস্য অবাস্তবতা অধিক কাম্য। পদ্ম-গোখরো-তে কাহিনি এক্ষেত্রে যে দিকে বাঁক নিয়েছে তাতে পাঠক হিসাবে আমাদের বিশ্বাসবোধ পীড়িত হয়। বাস্তবে কখনো কোনো শ্বশুর-শাশুড়ি তাদের মেয়ে-জামাই এর সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারে না তা নয়, তবে এও সত্য, যে তা সাধারণ সত্য নয়। বিশেষত ধরা পড়ার পর জামাইকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চাওয়ার বিষয়টি। কাহিনি এখানে আমাদের বিশ্বাসবোধের সীমা ছাড়িয়ে আর কোনো লোকে পাড়ি দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন, এই যে বিশ্বাসের বেড়া ডিঙানো তা গল্পের জন্য কতটা অপরিহার্য ছিল। পাঠক হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি পদ্ম-গোখরো-র মূল উপজীব্য মানবী মা ও সর্প সন্তানের সম্পর্কের ইতিকথা। গল্পের এই যে মূল উপজীব্য তার সঙ্গে জোহরা-র বাবা-মায়ের গহনা চুরির প্রসঙ্গ কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়। গল্পের ভাবসত্যের সঙ্গে এর যোগসূত্র নিতান্ত বাহ্যিক। এদিকে এই বাহ্যিক সম্পর্ককে উপলক্ষ্য করেই গল্পের উপসংহারে পৌঁছানো হয়েছে। অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ জোহরার বাবা যখন ফিরে এসেছে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে, মেয়েকে একবার চোখের দেখা দেখতে, তখন জোহরার সর্প-সন্তান দ্বয় তাকে দংশন করেছে। জোহরার বাবাও প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে হত্যা করেছে সাপ দুটিকে। একদিকে বাবা অন্যদিকে সন্তান, দুই এর এমন আকস্মিক মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলো লুটিয়ে পড়েছে জোহরাও। গল্প শেষ হয়েছে এইভাবে : "ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মির সাহেবদের সোনার বউ এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।"

গল্পের এই যে উপসংহার, তাতে এমনিতে যে শৈল্পিক বাস্তবতার বিশেষ অভাব আছে তা বলা যাবে না। জোহরার সর্প-সন্তান ও মানব-সন্তানের মধ্যেকার সেতুবন্ধনটি বেশ দৃঢ় হয়েছে। জোহরার দুটি পুত্র সন্তানের জন্মলাভ ও তাদের অকাল মৃত্যুর সংবাদ যথাসময়ে গল্পাঙ্গনে পরিবেশিত হয়েছে সন্তর্পণে এবং সেখানেই থেমে থাকেননি গল্পকার। দীর্ঘদিন পরে পিতৃগৃহ থেকে শ্বশুর গৃহে আসার পর জোহরা যখন তার সর্প-সন্তানদের দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়েছে তখন জোহরাকে, সেইসঙ্গে পাঠককেও অবগত করানো হয়েছে যে, তারা ঘুমিয়ে রয়েছে কবরের গভীরে। স্বপ্নযোগে সংবাদ-প্রাপ্তি মাত্র ঘুমন্ত জোহরা ছুটে গেছে তার মৃত পুত্রদের কবরের পাশে। অতঃপর নতুন করে সে তার সর্প-সন্তানদের সাক্ষাৎ পেয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, মানব ও মানবেতর প্রাণী এখানে একাত্ম হয়ে গেছে। গল্পের উপসংহারে, সর্প দ্বয়ের মৃত্যু আসলে আক্ষরিক অর্থে জোহরার দ্বিতীয়বার সন্তানহারা হওয়া। এমন প্রবল আঘাতের সমুদ্র সন্তরণ করতে ব্যর্থ হওয়া জোহরা নিজেকে সপে দিয়েছে মৃত্যুর হিমশীতল গভীরে। এর মধ্যে সেই অর্থে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। এখানে যা কিছু অস্বাভাবিকতা তার সবটাই তৈরি হয়েছে জোহরার বাবা মায়ের ক্রিয়াকলাপ ও এই বিষয়ে গল্পকারের সিদ্ধান্তকে ঘিরে। এখানে গল্পকারের শৈল্পিক অবস্থান সম্পর্কে পাঠকের মধ্যে কেমন যেন একটা সন্দেহ তৈরি হয়। আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, গল্পকারের মূল লক্ষ্য কী। তিনি কী প্রথাবদ্ধ সমাজবাস্তবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন তাঁর সৃষ্টিকে! না কি মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর সম্পর্কের নির্মাণ-বিনির্মাণ তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

পদ্ম-গোখরো-র উপসংহার দৃশ্যের একটা বিষয় সচেতন পাঠকমাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চুরি করা গহনা বিক্রির টাকায় হজ্ব করতে যাওয়ার পথে কলেরায় মায়ের মৃত্যু হয়েছে এবং সাপের কামড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে পিতাও; এই সংবাদ অবগত হওয়ার পর জোহরা কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি। সে বরং কঠিন কণ্ঠে বলেছে :"বেশ হয়েছে, জাহান্নামে যাক ওরা।" এই বলার শৈল্পিক যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। জোহরার বাবা-মায়ের অপরাধ সীমাহীন, হয়তো ক্ষমার অযোগ্যও। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, একমাত্র সন্তানও তাদের

ক্ষমা করতে পারবে না বা তাদের মৃত্যু সংবাদে দু-ফোটা চোখের জল ফেলবে না। গল্পকার এক্ষেত্রে তাঁর চরিত্রকে সে পথে একপাও অগ্রসর করাননি। গল্পের এই অংশের নির্মাণ থেকে যেন মনে হয়, শৈল্পিক বাস্তবতা অপেক্ষা নৈতিক বাস্তবতার রূপায়ণ গল্পকারকে অধিক তাড়িত করেছে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে স্মরণ করার, গহনা চুরির অর্থ সহযোগে জোহরার বাবা-মায়ের পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার বিষয়টি। মুসলিম সমাজে এমন অপকর্মের দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নেই। জীবনব্যাপী সচেতন বা অসচেতনভাবে হাজারও অপকর্ম করার পর শেষজীবনে হজ্ব করে পূত পবিএ হয়ে ওঠার চেষ্টা করা মুসলমান সমাজে বহুকালাবধি লালিত সত্য। গল্পকার যেন এই লালিত সত্যের বিপরীতে খড়্গহস্ত হতে চেয়েছেন। সত্যের বেশধারীদের মুখোশ খুলে দেওয়ার এক সচেতন প্রয়াস যেন এখানে সুস্পষ্ট। খুব সম্ভব, এই উদ্দেশ্য বশত গল্পকার জোহরাকে তার স্বাভাবিক মানবিকতার জায়গা থেকে সরিয়ে এসে নৈতিক মূল্যবোধের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর এই চাওয়ার মানবিক মূল্য অবশ্যই অনস্বীকার্য। তবে এর শৈল্পিক মূল্য কতখানি তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

৩

জিনের বাদশা শিউলি মালা-র দ্বিতীয় গল্প। এমনিতে একে প্রেমের গল্প হিসাবে চিহ্নিত করা শ্রেয়। তবে প্রথাবদ্ধ প্রেমের গল্পের থেকে এর রং বেশ অনেকটাই আলাদা। নায়ক আল্লারাখা ও নায়িকা চানভানু, দুজনেই যৌবনের উচ্ছ্বলতায় ভাস্বর। আল্লাররাখার দুরন্তপনায় গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ বললেও কম বলা হয়; বস্তুত একেবারে বিধ্বস্ত। এমন আশ্চর্যরকম বেয়াড়া স্বভাবের যে আল্লারাখা সে তার সমস্ত বেয়াড়াপনাকে বিজর্সন দিয়েছে চানভানুর পদতলে। ভালোলাগার মানুষ চানভানুকে জয় করার জন্য আল্লারাখা নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে প্রচেষ্টার দিগন্ত বরাবর। সে কখনো নদীর ঘাটে চানভানুর একটু স্পর্শ পাওয়ার আশায় জল-ভূতের বেশ ধারণ করেছে, কখনো বা গেছো ভূতের বেশ ধরে ভণ্ডুল করে দিতে চেয়েছে পাশের গ্রামের জনৈক ছেলের সঙ্গে চানভানুর বিয়ের সম্বন্ধ। এ কাজে সে সাগরেদ হিসাবে জুটিয়ে নিয়েছে কাউকে কাউকে।

নায়ক আল্লারাখা ও নায়িকা চানভানু, দুজনেই যৌবনের উচ্ছ্বলতায় ভাস্বর। আল্লাররাখার দুরন্তপনায় গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ বললেও কম বলা হয়; বস্তুত একেবারে বিধ্বস্ত। এমন আশ্চর্যরকম বেয়াড়া স্বভাবের যে আল্লারাখা সে তার সমস্ত বেয়াড়াপনাকে বিজর্সন দিয়েছে চানভানুর পদতলে। ভালোলাগার মানুষ চানভানুকে জয় করার জন্য আল্লারাখা নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে প্রচেষ্টার দিগন্ত বরাবর।

সাগরেদদের যোগ্য সহায়তায় চানভানুকে জয় করার পথে বেশ খানিকটা অগ্রসর হতে পেরেছে আল্লারাখা। প্রথম দিন ভালোলাগার মানুষকে যে নিদারুণ ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছিল সে আজ তার অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। চানভানু এখন মনে মনে কামনা করে তার বর্তমান বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাক, পরিবর্তে আল্লারাখার ক্রোড়ে নিজেকে সমর্পণ করার সুযোগ পাক সে। কিন্তু চানভানুর এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। বাইরের প্রতিবন্ধকতা মাথা তুলে দাঁড়ায়; কিন্তু তার থেকেও প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে আল্লারাখার ভিতরকার পরিবর্তন। চানভানু তখন সবে তার প্রতি একটু নরম হতে শুরু করেছে। এমন অবস্থায় একদিন আল্লারাখা মিথ্যা করে বলে তার সাপে কেটেছে, চানভানু যেন তাকে একটু শুশ্রূষা করে। আল্লারাখার এই কাতর আবেদন সেদিন উপেক্ষা করতে পারেনি চানভানু। নির্জনে নিজের সমস্তটা দিয়ে আল্লারাখার সেবা করে সে;

আর তাতেই সব হিসাব যায় ওলটপালট হয়ে। একদিনের ক্ষণিকের প্রাপ্তিকে চিরদিনের সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করে আল্লারাখা । চানভানু যে তার পায়ে মুখ লাগিয়ে দূষিত রক্ত তুলে আনার চেষ্টা করেছে, এর থেকে বড় প্রাপ্তি জীবনে আর কিছু হতে পারে না বলে মনে হয় তার । সে তাই চানুভানুর বিয়ের পথে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না। লাল শাড়ী পরে চানভানু যেদিন শ্বশুর গৃহে যাত্রা করে সেদিন আল্লারাখা তার সমস্ত দুরন্তপনার ইতি ঘটিয়ে প্রস্তুত হয় আগামী দিনের যোগ্য কৃষাণ হয়ে ওঠার জন্য; ঠিক তার বাবার মতো : "চানভানুর যে রাত্রে বিয়ে হয়ে গেল, তার পরদিন সকালে আল্লারাখা বাপ মা ভাই সকলে আল্লারাখাকে দেখে চমকে উঠল। তার সে বাবরি চুল নেই, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, পরনে একখানা গামছা, হাতে পাঁচনি, কাঁধে লাঙ্গল।"

বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গনে পা রেখে কালে কালে বহু প্রেমিক পুরুষের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছে আমাদের। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর কৃষ্ণ থেকে শুরু করে মহুয়া পালার নদ্যারচাঁদ কিংবা লায়লী মজনু-র মজনু। বৈচিত্র্যের শেষ নেই। এই সীমাহীন বৈচিত্র্যের মাঝেও আল্লারাখাকে কারও সঙ্গে ঠিক মেলানো চলে না। সে একান্তভাবেই তার মতো। ভালোবাসার মানুষের স্পর্শ পাওয়ার জন্য সে যে সব পরিকল্পনা করেছে তা আক্ষরিক অর্থেই উদ্ভট। এমন পরিকল্পনা একদিকে যেমন তাকে বিশেষত্ব মণ্ডিত করেছে অন্যদিকে তেমনি উন্মোচিত করেছে তার হৃদয়ের অন্তস্থলকে। ভালোবাসা কোনো যুক্তির ধার ধারে না; প্রেমিক পুরুষ বাধা পড়ে না ভালোমন্দের কোনো বাঁধনে। যেটাকে সে ভাল মনে করে সেটাই করে। আল্লারাখা তেমনি উন্মাদ প্রেমিক পুরুষদের একজন। তার উন্মাদনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কোনো কিছু করার আগে সাত পাঁচ সবকিছু যে ভালো করে ভেবে দেখতে হয়, দেখে নিতে হয় দশদিক সেই বোধটাই তার হারিয়ে গেছে। তাই বহু অর্থ ব্যয় করে কলকাতা থেকে একটা চিঠি ছাপিয়ে এনেছে সে; যে চিঠির সার কথা, বর্তমান সম্বন্ধ অনুসারে বিয়ে হলে পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষের চরম অকল্যাণ হবে। এ চিঠি প্রচারিত হয়েছে ভূতের নামে। অর্থাৎ ভূতই সতর্ক করছে উভয় পক্ষকে।

ন্যূনতম হিতাহিত জ্ঞান যার আছে সেও জানে ভূতের নামে ছাপানো চিঠি বিশ্বাসযোগ্য নয়। চানভানুর প্রেমে পাগল আল্লারাখা এখানে তার সামান্যতম বিচার বুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলেছে। তবে এই হারিয়ে ফেলার মধ্যেও যে একটা সত্য রয়েছে সেই সত্যের স্পর্শে সে সোনা ফলিয়েছে তার প্রেম-জীবনে। প্রেমের পথে একশো ডিগ্রি দিক পরিবর্তন করেছে চানভানু। যে মানুষটা তার জন্য সম্ভব-অসম্ভব এত কিছু করতে পারে তার ভালোবাসার গভীরতা সামান্য নয়, এটা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেছে চানভানু। তাই সে আল্লারাখার ভালোবাসার মানুষের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। একদিকে নিজেকে প্রস্তুত করেছে চানভানু, অন্যদিকে ভাবনার পথ ধরে ক্রমশ নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে আল্লারাখা। ফলত দৃশ্যত একটা বিরাট বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে। সচেতন সামাজিক মাত্র জানেন, এই বৈপরীত্য অপ্রিয় হলেও অনস্বীকার্য বাস্তব। একে মেনে নিয়ে জীবন-সমুদ্রে ভেলা ভাসাতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জীবনে যা বাস্তব শিল্পের অঙ্গনে তার ফসল ফলাতেই হবে এমন কোনো দায় সংবেদনশীল সাহিত্যিকের দিক থেকে স্বীকার্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর তাই যদি হয় তবুও কথা থেকে যায় অন্যদিক থেকে।

জিনের বাদশা-য় কাহিনির এই যে পরিণতি তা কতটা শিল্পসম্মত ! নায়ক ও নায়িকার সম্পূর্ণ বিপরীত মুখি পরিবর্তন শিল্পের আলোয় ভাস্বর অথবা নয়। কথা প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে-র নায়ক কৃষ্ণের কথা উল্লেখ করেছি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্মরণীয় সৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নায়ক-নায়িকা রাধা ও কৃষ্ণ প্রেমের পথে পরিক্রমা করতে করতে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে উপনীত হয়েছে। প্রথম জীবনে কৃষ্ণের প্রতি প্রবল বীতরাগ ছিল যে রাধার পরবর্তীতে সেই রাধাই কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলপারা হয়েছে। বিপরীত ক্রমে রাধার নামে অজ্ঞান ছিল যে কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ কাহিনির পরিণতিতে রাধাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করেছে। প্রেমের এই লীলাখেলা চিরন্তন, একে অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। জিনের বাদশা-র প্রেমচিত্রে সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিবিম্বন আছে। তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশকালের কিছু নিজস্ব ভাবনা; স্রষ্টার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনবোধ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ রাধা-কৃষ্ণ বিপরীত মুখি প্রেম-ঝড়ে ধ্বস্ত হয়েছিল দানখণ্ড-এ প্রথম দেহমিলনের প্রেক্ষিতে। জিনের বাদশা-য় একই ফল ফলেছে সামান্য দৈহিক স্পর্শে। চাদভানুর ঠোটের আলতো স্পর্শ আল্লারাখাকে অন্য মানুষে পরিণত করেছে। এই যে পরিবর্তন

সেখানেই রয়েছে সময়ের অভিঘাত। আজকের যুগ রোমান্টিকতার যুগ; আর ব্যক্তিগত ভাবে নজরুল চূড়ান্ত রোমান্টিক প্রেমিক-পুরুষ। এমন অবস্থায় প্রেমের রথ যে পথে অগ্রসর হওয়ার সেই পথেই অগ্রসর হয়েছে। বলা যায়, জিনের বাদশা-তে প্রেমচিত্রের যে রূপায়ণ আছে তাতে রয়েছে গল্পকারের নিজস্বতার বিশেষ ছাপ।

৪

শিউলিমালার তৃতীয় গল্প অগ্নিগিরি। এ গল্পেও প্রেম প্রথম ও শেষ কথা। অনাথ বালক সবুর আখন্দ সম্পন্ন গৃহস্থ নসিব মিয়াঁর বাড়িতে থেকে স্থানীয় মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে। সবুর নামে যেমন সবুর, কাজেও তেমনি। কোনো কিছুতেই তার কোনো রাগ উত্তাপ নেই। একদিকে তার সামাজিক অসহায়ত্ব, অন্যদিকে বিশেষ ধরনের এই স্বভাব। দুই এ মিলে সে বেশ আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। পাড়ার ছেলেরা তার শান্ত স্বভাবের সুযোগ নিয়ে ন্যায়-অন্যায় যে কোনো পথে তাকে চূড়ান্তভাবে বিব্রত করে। এভাবে বিব্রত ও কখনো কখনো বিধ্বস্ত হওয়ার পরেও সবুর কোনোরকম প্রতিবাদ করে না। কোনোক্রমে পালিয়ে এসে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে; ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। নিতান্ত শান্ত স্বভারের এমন যে সবুর আখন্দ সেই একদিন অত্যন্ত অশান্ত হয়ে ওঠে। সে ছেলেদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় প্রবলভাবে। তার প্রতি আক্রমণে অত্যন্ত বেহাল অবস্থা হয় ছেলের দলের। এইসময় বন্ধুদের দুরবস্থা দেখে একটি ছেলে সহসা ছুরি দিয়ে আঘাত করে বসে সবুরকে। সবুর ছেলেটির হাতের ছুরি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে ধ্বস্তাধ্বস্তির হয় এবং ঘটনাচক্রে ছুরিটি গিয়ে লাগে ছেলেটির বুকে। এতে মৃত্যু হয় তার। ফলত জেল হয় সবুর আখন্দের।

গল্প সামান্যই। এই সামান্য গল্প অসামান্য হয়েছে অন্য কারণে। সবুর যে বাড়িতে জায়গির থাকতো সেই নসিব মিয়াঁর একটি মেয়ে ছিল যে বয়সে সবুর এর থেকে সামান্য ছোটো। নাম তার নূরজাহান। নূরজাহান কিছুতেই মেনে নিতে পারতো না পাড়ার ছেলেদের অন্যায় আচরণ; তার কাছে আরও অসহ্য বলে মনে হত সবুর-এর সব কিছু মুখ বুজে মেনে নেওয়া। সে তাই একদিন মরিয়া হয়ে সবুরকে বলেছিল : "আপনি বেডা না? আপনারে লইয়া ইবলিশা পোলাপান যা তা কইব আর হুইনা ল্যাজ গুডাইয়া চইলা আইবেন? আল্লা আপনার হাত-মুখ দিছে না?" নূরজাহানের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সবুর জানতে চেয়েছিল—"ওই পোলাপানেরে যদি জবাব দিই, তুমি খুশি হও?" তার এমন জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে নূরজাহান শ্লেষের সুরে বলেছিল—"কে জবাব দিব, অপনি?" অতঃপর ঘটে যায় উল্লেখিত প্রলয় কাণ্ড।

গল্পের নাম অগ্নিগিরি। এ নাম তাৎপর্যপূর্ণ নায়ক সবুর এর সাপেক্ষে। আমরা আগ্নেয়গিরির কথা জানি, জানি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির বিষয়েও। বহুকাল সুপ্ত অবস্থায় থাকার পর সহসা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি যখন জেগে ওঠে তখন তার রুদ্র রূপের প্রভাবে বিপন্ন হয় জীবজগৎ। সবুরও যেন একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। তার রুদ্র রূপের স্পর্শে ধ্বস্ত হয়েছে পাড়ার ছেলেরা। এই প্রেক্ষিতে গল্পের নাম হতেই পারতো আগ্নেয়গিরি। কিন্তু গল্পকার তা চাননি। আগ্নেয়গিরি না বলে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে অগ্নিগিরি নামে চিহ্নিত করেছেন। কেন এই পরিবর্তন? হতে পারে গল্পকার নায়ক সবুর আখন্দকে সাধারণ মানবিক সত্যের বাইরে অন্য কোনো রূপে দেখতে চাননি; পাঠক সমাজের কাছে তাকে পরিবেশন করতে চাননি আর কোনো পরিচয়ে। হয়তো তিনি অগ্নিগিরি কথাটিকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন একান্ত প্রতীকি রূপে। এর সঙ্গে সাধারণ প্রাকৃতিক সত্যের কোনো সম্বন্ধ নেই।

সে যাই হোক, এখন অন্য কথায় আসা যাক। অগ্নিগিরি-র কাহিনিতে বেশ একটু নাটকীয়তা আছে। প্রশ্ন হল, এই নাটকীয়তাই কি গল্পের মূল উপজীব্য? আমাদের মনে হয়, না তা একদমই নয়। নজরুল সে ধারার লেখক নন। নাটকীয়তা মাত্রকে পাথেয় করে তিনি কখনোই গল্পের পথে পা বাড়ান না। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। অগ্নিগিরি-তে আপাত নাটকীয়তার অন্তরালে আত্মগোপন করে রয়েছে এক অতলান্ত হৃদয়-ভাব; নর-নারীর সম্পর্কের ঘাত প্রতিঘাতের চূড়ান্ত বর্ণিল রূপ। সবুর আখন্দ অনাথ বালক; ত্রিভুবনে তার প্রিয়জন বলতে কেউ নেই। নসিব মিয়াঁকে নিতান্ত পরগাছার মতো করে আঁকড়ে ধরে আছে সে। এমন অবলম্বন থেকে বিচ্যুত হওয়া তার জন্য মোটেই শুভ হবে না। কাজেই সবুর দুনিয়ার সমস্ত প্ররোচনা থেকে নিজেকে হেফাজত করে। বহু দিন যাবৎ নূরজাহানকে পড়াচ্ছে সে। কিন্তু কোনো দিন একবারের জন্যও তার দিকে মুখ তুলে তাকায়নি। আজ তার এই দুরন্ত সংযমের প্রাচীরে বড়ো সড়ো ফাটল ধরলো। নূরজাহানের জিজ্ঞাসার উত্তরে তার মুখের উপর চোখ রেখে সব হিসাব গেল ওলোট পালট হয়ে। এ অনন্যসুন্দর মুখ ও মনকে খুশি করার জন্য সব কিছু

করা যায়। তেমন কিছু করার আকাঙ্খা থেকেই সবুর জানতে চেয়েছিল : "ওই পোলাপানেরে যদি জবাব দিই, তুমি খুশি হও?" কিন্তু দুর্ভাগ্য। নূরজাহান তার পৌরুষত্বের উপর উপযুক্ত আস্থা রাখতে পারেনি। সবুর এর জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে ছুঁড়ে দিয়েছিল শ্লেষাত্মক আর এক জিজ্ঞাসা "কে জবাব দিব, অপনি?" ভালোবাসার মানুষের এমন শ্লেষাত্মক উচ্চারণ সুপ্ত আগ্নেয়গিরিকে জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। এক্ষেত্রে সুপ্ত সবুর শুধু জেগে ওঠেনি, রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

আমরা অগেই বলেছি, অগ্নিগিরি-তে নাটকীয়তা আছে, কিন্তু নাটকীয়তা এখানে গল্পকারের উপজীব্য নয়। তিনি ভেলো ভাসাতে চেয়েছেন প্রেমের সমুদ্রে। এক্ষেত্রে প্রেম-সমুদ্রে তাঁর সে ভাসমান ভেলায় সওয়ারি হন সহৃদয় পাঠকমাত্র। যে অর্থে আমরা ভালোবাসাবাসি বলি তেমন করে নূরজাহান বা সবুর কেউ কাউকে ভালোবাসেনি। সবুর সম্পর্কে নূরজাহন তার মনের গোপন কোনে সামান্য দুর্বলতাকে লালন করতো মাত্র। এই লালিত দুর্বলতাই পাপড়ি মেললো; প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে ফুটলো ঘটনাচক্রে। নূরজাহান এর মুখের উপর চোখ রেখে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো সবুর আজ চূড়ান্ত প্রেমিক পুরুষ। তার এতদিনের লালিত জীবনবোধ আর আজকের এই প্রেমিক মনের স্পর্শ, দুই এর সংঘাতে রক্তাক্ত হয়েছে সে। আর তার সে রক্তাক্ত মনের রূপায়ণে যেন নিজেকে নিংড়ে দিয়েছেন গল্পকার : "সবুর যেন ভুলেই তার ব্যথিত চোখ দুটি নূরজাহানের মুখের উপর তুলে ধরলো! কিন্তু চোখ তুলে যে রূপ সে দেখলে, তাতে তার ব্যথা লজ্জা অপমান সব ভুলে গেল সে। দুই চোখে তার অসীম বিস্ময় অনন্ত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। এই তুমি! সহসা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—'নূরজাহান'।" এখানেই শেষ নয়। প্রেমিক সবুরকে আরও আকর্ষণীয়, আরও জীবন্ত করে তোলার প্রশ্নে গল্পকার যেন কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ডানায় ভর করে অতিক্রম করতে চাইছেন শব্দের আভিধানিকতাকে : "আজ চিরদিনের শান্ত সবুর চঞ্চল মুখর হয়ে উঠেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে ঝড় উঠেছে। মৌনী পাহাড় কথা কয় না, কিন্তু সে যেদিন কথা কয়, সেদিন সে হয়ে ওঠে অগ্নিগিরি।"

মহাসাগরে ঝড় উঠলে সে ঝড়ের প্রাবল্যে ধ্বস্ত হয় সমস্ত কিছু; নূরজাহানতো সেখানে নিতান্ত সামান্য বিষয়। সঙ্গত কারণে সেও বিপর্যস্ত হয়েছে। সবুর এর নতুন রূপের, নতুন মনের উপর সে যেমন আস্থা রাখতে পারেনি তেমনি তাকে অবিশ্বাসও করতে পারেনি। বিস্ময়াবিষ্ট হওয়াই হয়েছে তার ভবিতব্য : "নূরজাহান বিস্ময়-বিমূঢ়ার মতো তার চোখের দিকে চেয়ে ছিল। এ কোন বনের ভীরু হরিণ? অমন হরিণ-চোখ যার, সে কি ভীরু না হয়ে পারে?...মানুষের চোখ যে এত সুন্দর হতে পারে—তা আজ সে প্রথম দেখল।" একদিকে বিস্ময়াবিষ্ট হওয়া অন্যদিকে ভালোবাসার অতলান্ত সলিলে সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে যাওয়া। আজকের এই দিনটির পরে আর একদিন এক মুহূর্তও নূরজাহানের পক্ষে যাপন করা অসম্ভব সবুর-ভাবনা নিরপেক্ষভাবে। চাঁদের আকর্ষণে যেমন বিস্তীর্ণ সমুদ্র জুড়ে উত্তাল জোয়ার ওঠে সবুরের ওই কালো দুটি চোখের আকর্ষণে তেমনি করেই প্রেমের জোয়ার উঠেছে নূরজাহান এর জীবন-সমুদ্রে। কিন্তু হায়, সে জোয়ারে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে ভাসিয়ে দেওয়ার সুযোগ হলো কই! নূরজাহানকে খুশি করতে গিয়ে সবুর এমন কিছু করে বসলো যাতে ঘটলো প্রাণহানির মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা। এ ঘটনার প্রবল অভিঘাতে শুধু দুটি জীবন বিপন্ন হলো না; কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হলো নসিব মিয়াঁর সাংসারিক জীবনও। এতদিন বাড়িতে থাকলেও কী নসিব মিয়াঁ, কী তার স্ত্রী কেউই ঠিক মতো উপলব্ধি করতে পারেনি সবুর মনে মনে কতখানি অধিকার করেছে তাদের মনের অঙ্গন। পদ্মা উঠে গিয়ে আজ যখন উন্মুক্ত অঙ্গন রঞ্জিত হলো ভালোবাসার রঙে তখন দৃশ্যত বেসামাল হয়ে পড়লো তারা। জেলের পথের যাত্রী সবুর এর ভার বহন করা সম্ভব হল না তাদের পক্ষে। সংসারিকতা থেকে অবসর নিয়ে মক্কাগমনকে তাই শ্রেয় বলে মনে করলো তারা।

নূরজাহানও তার বাবা মায়ের সঙ্গে মক্কাবাসী হবে। এক্ষেত্রে তার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা জেল জীবন সমাপণ অন্তে সবুর যেন মক্কায় এসে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, গ্রহণ করে তাকে। নূরজাহানের এমন আকাঙ্ক্ষার দিগন্ত বরাবর নিজেকে সম্প্রসারিত করে দেওয়ার থেকে পবিত্র কর্ম জীবনে আর কিছু আছে বলে সবুর মনে করে না। আজ থেকে সে তাই তার প্রতিটি ক্ষণকে অতিক্রম করবে সেই দিনটির প্রত্যাশায়। সবুর জানে না তার এ প্রত্যাশা পূর্ণ হবে কি না! ভাগ্যলাঞ্ছিত জীবনে তেমন সৌভাগ্য-সূর্য উদিত না হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলে তার মনে হয়। সে তাই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে নূরজাহানকে উদ্দেশ্য করে : "আল্লায় যদি এই দুনিয়ার দেখবার না দেয়, যে দুনিয়াতে তুমি যাও আমি খুঁইজ্যা লইবাম।" একজন প্রেমিক পৌরুষের পক্ষে এর থেকে অতিরিক্ত আর কিছু নিবেদন করার

থাকে না তার ভালোবাসার মানুষের জন্য। বলা যায়, চিরপ্রেমিক নজরুল এখানে তাঁর শাশ্বত প্রেম-ভাবনার স্পর্শে সিক্ত করেছেন প্রেমিক সবুরকে।

অগ্নিগিরি-তে প্রেমিক সবুর এর বিপরীতে নূরজাহান এর যে চিত্রণ তা আকর্ষণীয় নিশ্চয়ই, তবে সে আকর্ষণ শর্ত নিরপেক্ষ কোনো সত্য নয়। নূরজাহান এখানে ততটাই আলোকিত সবুর তার উপর ঠিক যতটা আলো বিতরণ করে। এ যেন পৃথিবী এবং চাঁদের সম্পর্ক-কথার অনুরূপ। পৃথিবীর আলোয় আলোকিত হয় চাঁদ, সবুরের আলোয় আলোকিত হয়েছে নূরজাহান। আর ওদিকে সব আলোর উৎস যেমন সূর্য এখানেও তেমনি লেখক-মন। নজরুলের প্রেম-ভাবনার আলোয় আলোকিত হয়েছে অগ্নিগিরি-র অঙ্গন। বিশেষ করে ধৌত হয়েছে সবুর ও নূরজাহান।

৫

শিউলিমালা-র চতুর্থ ও নাম গল্প শিউলিমালা। বিশুদ্ধ প্রেমের গল্প বললে এ গল্প সম্পর্কে সবটা বলা হয় না। প্লেটোনিক লাভ বলে শিল্প সাহিত্যে একটি কথা প্রচলিত আছে। ভালোবাসা যেখানে শুধুই ভালোবাসার জন্য; এর অতিরিক্ত কোনো সত্য ছায়াপাত করতে পারে না প্রেমিক-প্রেমিকার মনের অঙ্গনে তাকেই বলা হয় প্লেটোনিক লাভ। শিউলিমালা-র নায়ক আজহার এমন প্লেটোনিক লাভে দীপ্ত প্রেমিক-পুরুষ। জীবনের পথে চলতে চলতে আজহার সহসা পরিচিত হয়েছিল শিউলির সঙ্গে, শিলং এ বেড়াতে এসে। ক্রমে ক্রমে শিউলিকে সমস্ত সত্তা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল সে। তারপর একদিন জীবনের অনিবার্য নিয়মে ঘনিয়ে এসেছিল সেই পরম মুহূর্ত। শিলং এর শিউলি কে শিলং রেখে কলকাতার কর্ম-সমুদ্রে নিজিকে বিসর্জন দিয়েছিল আজহার। চলে আসার আগে আজহার শিউলিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, অতঃপর সে কী করবে। শিউলি জানিয়েছিল : "শিউলিফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিও।" সেই অবধি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজ করে আসছে অদ্যাবধি অবিবাহিত কলকাতা শহরের নামজাদা ব্যারিস্টার আজহার। আশ্বিন এর নির্দিষ্ট দিনের, নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় পরম যত্নে শিউলিমালা জলে ভাসিয়ে দেয় সে। কখনো, কোনাদিন, কিছুতেই এর ব্যতিক্রম হয় না

শিউলিমালা-য় সেই অর্থে কোনো কাহিনি নেই। না থাকারই কথা। বিশুদ্ধ প্রেম এমন এক সত্য যা বস্তু জগতের তথাকথিত কোনো অবলম্বন ছাড়াই ভাস্বর হতে পারে। বস্তু জগৎ কার্যকারণ সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। আর চিরন্তন প্রেম যে কোনো কার্যকারণ নিরপেক্ষ সত্য। এক্ষেত্রে সেই নিরপেক্ষতার জালে আবদ্ধ করা হয়েছে আজহার-শিউলির প্রেমকে। আমাদের মতো যারা গড়পরতায় সাধারণ মানুষ তাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, কেন দু-জন দু-জনকে প্রবলভাবে ভালোবেসেও এমন বৈরাগ্যের জীবন বেছে নিল। কোথাও কোনো বাধা ছিল না; তবু কেন তারা স্বেচ্ছায় দু-জনের মাঝে এই লবণাক্ত সমুদ্র রচনা করলো। বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই আমাদের কাছে, আমাদের মতো আরও অনেকের কাছেই। তবে আজহার বা শিউলি-র কাছে রয়েছে এর জলবৎ তরলং উত্তর। সাংসারিকতা, দৈনন্দিনতা এসব প্রেমের সাপেক্ষে বিষবৎ বিষয়। যথার্থ

প্লেটোনিক লাভ বলে শিল্প সাহিত্যে একটি কথা প্রচলিত আছে। ভালোবাসা যেখানে শুধুই ভালোবাসার জন্য; এর অতিরিক্ত কোনো সত্য ছায়াপাত করতে পারে না প্রেমিক-প্রেমিকার মনের অঙ্গনে তাকেই বলা হয় প্লেটোনিক লাভ। শিউলিমালা-র নায়ক আজহার এমন প্লেটোনিক লাভে দীপ্ত প্রেমিক-পুরুষ। জীবনের পথে চলতে চলতে আজহার সহসা পরিচিত হয়েছিল শিউলির সঙ্গে, শিলং এ বেড়াতে এসে। ক্রমে ক্রমে শিউলিকে সমস্ত সত্তা দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল সে। তারপর একদিন জীবনের অনিবার্য নিয়মে ঘনিয়ে এসেছিল সেই পরম মুহূর্ত।

প্রেমিক-প্রেমিকা কখনো এসবের স্পর্শে কলুষিত করে না তাদের প্রেমকে। আজহার ও শিউলিরাও তা করেনি।

অনেকে মনে করেন, বাঙালির প্লেটোনিক লাভ-ভাবনা নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ উনিশ শতকীয় জীবনবোধের ফসল। আমরা অবশ্যই তা মনে করি না। আমাদের জীবনে, আমাদের সংস্কৃতিতে অনুরূপ প্রেম ভাবনার চাষ প্রচলিত রয়েছে সেই প্রথম দিন থেকে। তথ্য-প্রমাণ হিসাবে আরও অনেক কিছুর পাশাপাশি বিশেষ করে উপস্থাপন করা যায় চণ্ডীদাসের রাধার কথা। চণ্ডীদাসের রাধা যে বোধে ভাস্বর হয়ে কৃষ্ণকে ভালোবেসেছে তাতে প্লেটোনিক লাভের উদ্বোধন ঘটেছে চূড়ান্ত রূপে। শুধু চণ্ডীদাস বা তার রাধা নয়, ভালোবাসার রসে অনুরূপভাবে জারিত হয়েছে যুগে যুগে আরও সব কবিমন ও তাঁদের সৃষ্ট চরিত্ররা। শিউলিমালা-র আজহার বা শিউলি সেই বহমান ধারায় ভেসে আসা সত্যের অন্য নাম। তাদের সৃষ্টির নেপথ্যে বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে স্রষ্টার জীবনবোধ। 'বিদ্রোহী কবি' নামের যে লেবেল নজরুলের উপর সেটে দেওয়া হয়েছে ঘনিষ্ঠ নজরুল পাঠক মাত্রই জানেন তা একান্ত আংশিক সত্য। নজরুল বিদ্রোহী নিশ্চয়ই, তবে তাঁর বিদ্রোহী মনের নেপথ্যে প্রেমিক-মনের স্পর্শই শেষ কথা। সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্তের মতে—'নজরুল প্রেমিক, নজরুল কবি, তাঁর বিদ্রোহ প্রেমিকের বিদ্রোহ'। অতি যথার্থ অভিমত। নজরুলের ব্যক্তিজীবন ও তাঁর সৃষ্টি জগতের আদ্যন্ত পাঠ নিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় প্রেম-ভাবনার বাইরে নজরুল-সাহিত্যে আর যা কিছুর ছায়াপাত আছে তা আসলে ছায়া মাত্র। প্রেমই এখানে প্রথম ও প্রধান কথা।

প্রেম-ভাবনায় ভাস্বর নজরুলের সৃষ্টি জগতে শিউলিমালা-র অনন্যতা অনস্বীকার্য। প্লেটোনিক লাভের তাত্ত্বিক রূপ এ গল্পে যেভাবে রূপায়িত হয়েছে অন্যত্র তার সমতুল দৃষ্টান্ত আছে বলে আমাদের জানা নেই। নজরুল সাহিত্য ধারায় তো বটেই, বাংলা সাহিত্যের আদ্যন্ত কালসীমাতেও। প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা-র কথা। শিউলির মতোই লাবণ্যও শিলং-কন্যা। তবু তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। অমিতকে তো বটেই, লাবণ্যকেও আমাদের সাধারণ বোধবুদ্ধির বাধনে বাঁধা যায়। কেটি ওরফে কেতকি রায়ের অপ্রত্যাশিত অথচ অনিবার্য আগমনের পর অমিত-লাবণ্যের প্রেম-তরী সে উত্তাল ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছিল সেখান থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঔপন্যাসিক নির্ধারিত পথের বাইরে আর কোথাও পা রাখার ছিল না। আজহার-শিউলির ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা একদমই তা নয়। তাদের প্রেমের পথে ছিল না কোনো বাধাই। তারা নিজেরাই বাধার প্রাচীর রচনা করেছে পরস্পরের মধ্যে; সম্পূর্ণতই স্বেচ্ছায়। এ স্বেচ্ছাচারিতার একমাত্র ঠিকানা প্লেটোনিকতা। প্লেটোনিক লাভের উত্তাপে তপ্ত হয়ে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তারা। কোনো বস্তুগত বা বাহ্যিক কার্যকারণ তাদের সিদ্ধান্তকে সামান্যতম প্রভাবিত করেনি। আর এখানেই প্লেটোনিক লাভের গল্প হিসাবে শিউলিমালা-র অনন্যতা।

শিউলিমালা-র সচেতন পাঠকের চোখে পড়বে গল্পের উপসংহার অংশে বিধৃত আজাহারের একটি উচ্চারণ : "আর তার সাথে দেখা হয়নি—হবেও না! একটু হাত বাড়ালে হয়তো তাকে ছুঁতে পারি, এত কাছে থাকে সে। তবু ছুঁতে সাহস হয় না। শিউলিফুল—বড়ো মৃদু, বড়ো ভীরু, গলায় পরলে দু-দণ্ডে আউরে যায়! তাই শিউলি ফুলের আশ্বিন যখন আসে—তখন নীরবে মালা গাঁথি আর জলে ভাসিয়ে দিই!" প্রথাবদ্ধ কোনো শব্দই উপযুক্ত নয় এই উচ্চরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য। উপলব্ধ সত্যের বাইরে এখানে আর কোনো সত্যের অস্তিত্ব নেই। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে শিউলির একটি বক্তব্য। শিলং থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার কালে আজাহার শিউলির কাছে জানতে চেয়েছিল, আমি না হয় আশ্বিনে শিউলি ফুলের মালা গেঁথে জলে ভাসিয়ে দেব; কিন্তু তুমি কী করবে! প্রত্যুত্তরে শিউলি বলেছিল :"আশ্বিনের শেষে তো শিউলি ঝরেই পড়ে"। রোমান্টিকতার প্রচলিত রং প্রেমের এই রঙকে ধারণ করার জন্য যথেষ্ট কী! এ উচ্চারণের সত্যতা, পবিত্রতা একান্তভাবে সেই প্রেমিক মনের সাপেক্ষে সত্য প্রেমের অমৃতরূপের স্পর্শে যে মন অতিক্রম করেছে বাহ্যিক বাধ্যবাধকতার সীমানা।

প্লেটোনিক লাভ তথ্যগতভাবে সত্য, আবার এও সত্য যে জীবন নিরপেক্ষ রূপে এই নিহিত সত্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। শিউলিমালা-র রূপকার তাই রক্ত-মাংসের শরীর ও প্রচলিত জীবনবোধের অঙ্গন সাপেক্ষভাবে তাঁর প্রেমের পুষ্পকে প্রতিস্থাপন করেছেন। গল্পে ফিরে ফিরে এসেছে দাবা খেলার অনুষঙ্গ। নায়ক আজহার দুরন্ত দাবাড়ু। দাবার বোর্ডে তাকে পরাস্ত করতে পারে এমন জন প্রায় নেই। আজহার বেছে বেছে তাদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করে যারা তার দাবা-সঙ্গী হতে পারে। দাবা এমন একটা খেলা যেখানে দাবাড়ু প্রায়শ হারিয়ে ফেলে বাহ্য জ্ঞান। আজহার এই যে দাবার বোর্ডে

নিজেকে এভাবে নিংড়ে দেয় এর মধ্যে দিয়ে সে আসলে ভুলে থাকতে চায় তার জীবনের ওই বেদনাদায়ক অধ্যায়কে। যদি এমন হতো, আজহারের জীবনে শিউলি এক অনুভূত সত্য মাত্র হয়ে থাকতো, তার কোনো বাহ্য সত্তা না থাকতো, না থাকতো এই জনিত কোনো ক্ষরণ তবে তাদের প্রেম তাত্ত্বিক সত্যের বেড়া ডিঙিয়ে আর কোনো সত্যের ভুবনে পা রাখতে পারতো না। কিন্তু গল্পকার তা চাননি। তিনি সর্বোপরি মানবিক বোধে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকে। তাই আজহার যখন একের পর এক তার জীবনের পাতা উল্টে গেছে তখন একটা সময়ে তার দাবাড়ু বন্ধুদের চোখ সিক্ত হয়েছে লবণাক্ত জলে : ''আমাদের চোখের জল লেগে সন্ধ্যাতারা চিকচিক করে উঠল''। বোঝা যায়, আবহমান কালের মানব-মানবীর মন-সমুদ্রে নিয়ত যে ব্যর্থ-প্রেমের ঝড় বইছে তাই ক্ষণে ক্ষণে পবিত্রতম সত্য ঝরে ঝরে পড়ছে ধূলি ধূসর ধরণিতে; লেখা হচ্ছে প্রেমের মহাকাব্য। শিউলিমালা চিরন্তন সে মহাকাব্যের একটি অধ্যায় মাত্র।

৬

গল্পগ্রন্থ শিউলিমালা নজরুল সাহিত্যিক্ষেত্রে তেমন পরিচিত বিষয় নয়। ঘনিষ্ঠ নজরুল পাঠকেরও গ্রন্থটির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় নেই বলে মনে হয়। অনন্ত তাদের লেখালিখি তেমন সাক্ষ্য বহন করে না। প্রথম গল্প পদ্ম-গোখরো-ই যা একটু পরিচিতি পেয়েছে। বাকি তিনটি গল্পই আবৃত রয়েছে অপরিচয়ের পুরু চাদরে। এই অপরিচয়ের কারণ কী! অনেকে অনেকভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। আমাদের মতে এর প্রথম ও প্রধান কারণ নজরুলের কবি খ্যাতি। কাব্য-কবিতার পাশপাশি নজরুল সৃষ্ট গদ্য সাহিত্য সামান্য নয়। উপন্যাস, গল্প, নাটক সবই তিনি লিখেছেন; কিন্তু এর কোনোটিই সেভাবে পরিচিতির আলোয় আলোকিত হয়নি। এমন মনে করলে ভুল হবে যে, রচনার অন্তর্নিহিত কারণের জন্য এমন হয়েছে। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার যে রূপায়ণ রয়েছে তার সমতুল দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে নেই বললেই চলে। 'সেতুবন্ধ' নাটকে পরিবেশ চেতনা যেরূপে মূর্ত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে তার উদাহরণ অবশ্যই প্রতুল নয়। এমন অজস্র দৃষ্টান্ত তুলে আনা যায় ইচ্ছা করলেই। এই সব দৃষ্টান্তের বিপরীতে গদ্যশিল্পী নজরুল সম্পর্কে আমাদের চেনা জানার অপ্রতুলতা নিতান্তই অপ্রীতিকর। এ অপ্রীতির সীমানাকে যত দ্রুত সম্ভব, যত বেশি সম্ভব সঙ্কুচিত করে আনা দরকার। আর তার জন্য প্রয়োজন আরও আরও বেশি করে আলোচনা। নজরুলের প্রত্যেক গদ্য রচনার অনুপুঙ্খ বিশ্লষণ।

যে কোনো সাহিত্য-কর্ম সুন্দর হয় ভাব ও রূপ এই দুটি দিক থেকে। শিউলিমালা-র গল্পগুলির ভাবসত্য বিষয়ে আমরা আমাদের কথা বলেছি। এখন রূপগত দিক নিয়ে দুই-এক কথা বলে আপাতত শেষ করা যেতে পারে এই আলোচনা। কাব্য-কবিতা অপেক্ষা গদ্য রচনায় রূপের বৈচিত্র্য বেশি লক্ষণীয়। নজরুল সৃষ্ট গদ্য সাহিত্যেও তার পরিচয় বিধৃত রয়েছে। নজরুলের 'বাঁধনহারা' বা 'কুহেলিকা' আঙ্গিকের বিচারে বাংলা কথাসাহিত্যে অভিনব সংযোজন। তাঁর বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী বা এই শ্রেণির আরও অনেক রচনায়ও রয়েছে এই অভিনবত্বের লক্ষণ। শিউলিমালা-র গল্পগুলি অবশ্য সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। আঙ্গিকগত তেমন কোনো নতুনত্ব এখানে নেই। প্রচলিত ঢঙে গড়ে তোলা হয়েছে গল্পের কলেবর। বর্ণনা এবং সংলাপের যুগলবন্ধন ধারণ করেছে বিষয় ও ভাবকে। বর্ণনার ভাষা মোটের উপর প্রথানুগ। সংলাপে বৈচিত্র্য রয়েছে। স্থানে স্থানে তা রীতিমতো চিত্তাকর্ষক। বিশেষত অগ্নিগিরি-তে বখাটে বালকদের সংলাপ। সবুরকে রাগিয়ে দেওয়া বা বিব্রত করার জন্য তারা যেসব বাক্যবাণ প্রয়োগ করেছে তা একান্তভাবে তাদের নিজস্ব। আমরা এসবের সঙ্গে তেমন পরিচিত নই। বোঝা যায়, গল্পকার তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতার ঝুলি উপুড় করে দিয়েছেন এক্ষেত্রে।

নজরুল সাহিত্যের, বিশেষত তাঁর কবিতার ভাষারীতি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। তাঁর কবিতার ভাষায় অতিরিক্ত আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহার না পছন্দ হয়েছিল অনেকেরই। নজরুল তাদের সে না পছন্দের উত্তরে যে কথা বলেছিলেন তাতে একটা কথাই বড় হয়ে উঠেছিল, প্রয়োজনীয়তা। বিষয় ও ভাবকে মূর্ত করে তোলার জন্য যেখানে যে শব্দ, যে ভাষা প্রয়োগ করা দরকার বলে মনে হয়েছে তিনি তাই করেছেন। তথাকথিত প্রভু বা প্রভুদের নিষেধবাণীকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন ফুৎকারে। অগ্নিগিরি-র ঘনিষ্ঠ পাঠ নিলে বোঝা যায় এক্ষেত্রে নিজের কাছে তিনি কতখানি সৎ ও সুন্দর ছিলেন। বোঝা যায়, কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল তাঁর অভিজ্ঞতার সীমানা। দিগন্ত-বিস্তৃত ভাষা-জ্ঞান ও তার শৈল্পিক রূপায়ণ শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শেষ কথা না হলেও অন্যতম প্রধান কথা। শিউলিমালা-র গল্প সমূহ তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

('দোলনচাঁপা' পত্রিকা থেকে গৃহীত)

নজরুলের গল্প : সমাজ-সংস্কৃতি

মিরাজুল ইসলাম

নজরুলের সাহিত্য জীবনের ব্যাপ্তি দুই দশক পর্যন্ত। এর মধ্যে গল্পগুলি তাঁর প্রথম জীবনের রচনা। পরবর্তীতে তিনি গল্প লেখেননি। তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন তাঁর বন্ধু ছিল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শৈলজানন্দ কবিতা দিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন আর নজরুলের প্রবেশ গল্প দিয়ে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে শৈলজানন্দ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন কথাসাহিত্যিক হিসাবে আর নজরুল কবি হিসাবে। নজরুল নিজেও তাঁর সাহিত্যের গতিবিধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধে বলছেন : "আমার সুন্দর প্রথমে এলেন ছোটগল্প হয়ে। তারপরে এলেন কবিতা হয়ে। তারপরে এলেন গান, সুর,ছন্দ, ভাব হয়ে।" এখানে তিনি পরিষ্কার করে তাঁর সাহিত্যের গতিবিধি সম্পর্কে বলেছেন। গল্পকার হিসাবে সাহিত্য জীবনে প্রবেশ করলেও, এখানে তিনি খুব একটা সাফল্য লাভ করতে পারেননি। গল্পের আঙ্গিক, গঠন, চরিত্র নির্মাণ, ভাষা, শিল্প সুষমার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় ব্যতিক্রমী পন্থা অবলম্বন করলেও উৎকর্ষ লাভ করতে পারেননি। তবে গল্পগুলিতে সুগভীর জীবন জিজ্ঞাসা আছে। নজরুল প্রথম জীবনে গল্প লিখতে বেশ উৎসাহী, তখন তিনি করাচি সেনা নিবাসে সৈনিক হিসাবে যোগদান করছেন। সেখানেই লিখছেন এবং গল্পগুলি প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছেন। যার ফলে তাঁর প্রথম দিককার গল্পগুলিতে লেখক হিসাবে থাকতো হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর গল্পগুলিতে যুদ্ধপটভূমি, সৈনিক জীবন বিধৃত হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, যে বছর তিনি সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ করছেন সেই বছরেই তাঁর মোট ছয়টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

নজরুলের তিনটি গল্পগ্রন্থে মোট আঠারোটি গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান', গল্প সংখ্যা ছয়টি; দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'রিক্তের বেদন', গল্পসংখ্যা আটটি; তৃতীয় গল্পগ্রন্থ 'শিউলিমালা', গল্পের সংখ্যা চারটি। পরবর্তীতে নজরুল -গল্পগ্রন্থে আরও দুটি গল্প সংযোজিত হয়েছে, 'বনের পাপিয়া', ও 'হারা ছেলের চিঠি'। তাহলে নজরুলের মোট গল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় কুড়িটি।

গল্পগুলির ভাববস্তু কে সামনে রেখে গল্পকার নজরুলের গল্পের সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা গল্পগুলিকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি।

১) প্রেমমূলক স্মৃতি প্রধান গল্প : বাদল-বরিষণে, অতৃপ্ত কামনা, রাজবন্দীর চিঠি, শিউলি মালা ইত্যাদি।

২) যুদ্ধ ও বিদেশী পটভূমিকায় বিধৃত গল্প : ব্যথার দান, হেনা, রিক্তের বেদন, মেহের নেগার, ঘুমের-ঘোরে, বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী ইত্যাদি।

৩) কল্পনা প্রধান গল্প : সাঁঝের তারা, সালেক, দুরন্ত পথিক প্রভৃতি।

৪) সামাজিক ও লোকপ্রচলিত কথার বিনির্মাণধর্মী গল্প : স্বামীহারা, পদ্ম-গোখরো, জিনের বাদশা, অগ্নি-গিরি ইত্যাদি।

৫) বিবিধ গল্প : বনের পাপিয়া, হারা ছেলের চিঠি।

প্রেমমূলক স্মৃতি প্রধান গল্প

বাদল-বরিষণে

বাদল-বরিষণ নায়কের স্মৃতিরোমন্থনের কাহিনি। গল্পের নায়িকা কাজরিয়া, শ্যামলা তার গায়ের রং, গল্প কথকের সাথে তার প্রেম হলেও তাদের মিলন হয়নি। এক বর্ষা বাদলের দিনে কাজরিয়ার সাথে কাটানো মুহূর্তগুলি মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মতো রোমন্থন করছেন কথক। কাজরিয়া কালো বলে তার

শৈলজানন্দ কবিতা দিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন আর নজরুলের প্রবেশ গল্প দিয়ে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে শৈলজানন্দ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন কথাসাহিত্যিক হিসাবে আর নজরুল কবি হিসাবে। নজরুল নিজেও তাঁর সাহিত্যের গতিবিধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধে বলছেন : "আমার সুন্দর প্রথমে এলেন ছোটগল্প হয়ে। তারপরে এলেন কবিতা হয়ে। তারপরে এলেন গান,সুর,ছন্দ, ভাব হয়ে।"

ধারণা তাকে কেউ ভালোবাসতে পারেনা, কেউ তাকে ভালোবাসে সেকথাও সে বিশ্বাস করতে চায়না। তাই তাকে কেউ ভালোবাসার মতো পবিত্র জিনিসের নামে প্রতারিত করুক কাজরিয়া চায় না। এই ভাবনায় কাজরিয়া নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে নায়কের থেকে। গল্পের মধ্যে নজরুল কবি সুলভ প্রেমের বিরহ-বেদনার ইতিবৃত্ত অঙ্কন করছেন।

অতৃপ্ত কামনা

কবিসুলভ ভঙ্গিতে প্রেমের বিরহ বেদনার, অশ্রুদীপ্ত প্রেমের স্মৃতিমূলক রচনা অতৃপ্ত কামনা। গল্পের মূল উপজীব্য কিশোর-কিশোরীর প্রেম, খেলার সাথি থেকে মনের সাথি। দুটি আত্মা একসাথে খুনসুটি করে বড়ো হয়েছে। খেলার সাথি থেকে কখন যে একে অপরের অবচেতন মনে মনের সাথি হয়ে উঠেছে ঠাওর করতে পারেনি দুজনে। গল্প কথক নায়িকা মোতিকে অনেক ভালোবাসে। তার বিশ্বাস তার মতো করে মোতিকে কেউ ভালোবাসতে পারে না। শেষপর্যন্ত এই ভালোবাসার মানুষটির হাতটি ধরে রাখতে পারেননি কথক, অন্য আর এক হাতে তুলে দিতে হয়েছে মোতিকে। কারণ যার সাথে মোতির বিয়ে হয়েছে সে তার থেকে অনেক বেশি যোগ্যতাবান, শিক্ষিত, সুন্দর, অর্থবান পুরুষ। তাই একে অপরকে প্রবল ভালোবাসলেও মিলিত হতে পারেনি নায়ক-নায়িকা। হৃদয়ের অতৃপ্তি, গল্পে বেদনা-বিরহের গাঁথা হয়ে ধ্বনিত হয়েছে।

শিউলি মালা

শিউলি মালা একটি অসাধারণ স্মৃতিচারণা মূলক প্রেমের গল্প। গল্পের নায়ক দাবা খেলোয়াড় ও ব্যারিস্টার মিস্টার আজহার। গল্পের নায়িকা প্রবীণ অধ্যাপক কন্যা সুন্দরী শিউলি। কথক শিলং বেড়াতে গেলে সেখানকার মনোরম পরিবেশে শিউলির সাথে পরিচয় ও প্রেম। দাবাপ্রিয় অধ্যাপকের বাড়িতে দাবা খেলার জন্য নিয়মিত যাওয়া, তারপর সেখানে শিউলিকে গান শেখানোর মধ্যে দিয়ে উভয়ের চোখে চোখে মন দেওয়া নেওয়া। গানের কণ্ঠ বিনিময় হলেও মালা বিনিময় হয়নি। অনুরাগ মিলনে পরিণত হওয়ার আগেই পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, এ বিদায় চিরবিদায় হয়ে উঠে। কিন্তু তাদের কাছে আসা ও বিদায় নেওয়া এই ক্ষণটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আজহার প্রতিবছর শিউলির কথা মতো শিউলিফুলের মালা গেঁথে আশ্বিন মাসের প্রথম দিনে জলে ভাসিয়ে দেয়।

যুদ্ধ ও বিদেশী পটভূমিকায় বিধৃত গল্প

ব্যথার দান, হেনা, রিক্তের বেদন, মেহের নেগার, ঘুমের-ঘোরে, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, ইত্যাদি গল্পে হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের সৈনিক ও সমর পটভূমির জীবনকথা বিদ্যমান। নজরুল যখন এই গল্পগুলি লিখছেন তখন তাঁর বয়স কুড়ির কাছাকাছি। সৈনিক জীবনে প্রবাসী হিসাবে নর-নারীর চিরন্তন প্রেমজাত বিরহ-বেদনার পাশাপাশি দেশ মাতৃকার প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যথার দান

গল্পটি রুশবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে রচিত এবং গল্পে মুক্তিসেবক সৈন্যদল লাল ফৌজের নামান্তর। গল্পের নায়ক দারা নায়িকা বেদৌরাকে ফেলে যুদ্ধে যায়, অন্যদিকে বেদৌরা সয়ফুলমূলকের প্রলোভনে পড়ে তার সাথে মিলনে জড়িয়ে পড়ে। এর পরে গল্পে আর দারা ও বেদৌরার সামাজিক মিলন হয়নি। দারা মুক্তি ফৌজে যোগদান করেছে ব্যর্থ প্রণয়ের ফলে, এবং বীরের মতো সংগ্রাম করে সে অন্ধ ও বধির হয়েছে।

গল্পটির উপস্থাপন কৌশল আত্মকথন রীতির। এই কৌশল ছোটগল্পের আঙ্গিক কাঠামোকে বিঘ্নিত করেছে। প্রথম প্রসঙ্গের নাম দারার কথা যা প্রায় চার পৃষ্ঠা ব্যাপী, এর পরে বেদৌরার কথা দুই পৃষ্ঠা, এবং সব শেষে উপনায়ক সয়ফুলমূলকের কথা। আবেগ ও আত্মকথন রীতির অতিকায়তা গল্পহীনতাকে প্রকট করেছে বেশি। গল্পের দেশপ্রেম এবং যুদ্ধের পটভূমি ও আন্তর্জাতিকতাবোধ পাঠককে নতুনত্বের স্বাদ এনে দেয়। গল্পের মূল উপজীব্য—মিলনে নয় বিরহে প্রেমের প্রকৃত সুখ। কথিকার রীতি গল্পের গঠন কাঠামোকে বিঘ্নিত করলেও গল্পটির বিশেষ আকর্ষণ, জীবনের প্রেম জড়িয়ে গেছে দেশপ্রেম চেতনার সাথে, অর্থাৎ মা-মাটি-মাতৃভূমির সাথে একাত্ম হয়ে গেছে।

হেনা : গল্পের নায়ক সোহরাব হেনার ভালোবাসা পায়নি। সোহরাব আফগানদের হয়ে যুদ্ধ না করায় আফগান মেয়ে হেনা সোহরাবের প্রেমকে অস্বীকার করে তাকে যুদ্ধে যাওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে। এর পরে সোহরাব যখন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে তখন হেনা আবার ভালোবাসা ব্যক্ত করেছে। যুদ্ধে হেনাও সহগামিনী হয়ে জখম হয়েছে। এ-গল্পের ট্রাজিক পরিণতি হেনা সোহরাবের মিলন হতে দেয়নি।

রিক্তের বেদন

রিক্ত ও বেদনাময় হৃদয়ের কাহিনি এখানে স্থান পেয়েছে। গল্পের পটভূমি বাংলাদেশ থেকে শুরু করে লাহোর, নৌশেরা, কুর্দিস্থান, কারবালা, করাচি পর্যন্ত বিস্তৃত। গল্পে নজরুলের সৈনিক জীবনের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। গল্পের নায়ক হাসিম প্রেমিকা শাহিদাকে উপেক্ষা করে কর্তব্যকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেছে। গল্পে গিয়ে সে জানতে পারে শাহিদার অন্যত্র বিয়ে হয়েছে। সে শাহিদাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। অন্যদিকে যুদ্ধের ময়দানে গুল নামে এক বেদুঈন মেয়ে হাসিমকে ভালোবাসে। কিন্তু এই গুল বিপক্ষ দলের, তাই সৈনিকের কঠোর দায়িত্ব পালনের তাগিদে বিদেশি প্রণয়ণী গুলকে নিজে হাতে গুলি করে হত্যা করেছে।

বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী : বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী গল্পটি বাঙালি পল্টনের এক বখাটে যুবকের আত্মকাহিনি। গল্পের নায়ক বাউন্ডুলে তার প্রথম স্ত্রী রাবেয়াকে প্রচন্ড ভালোবাসে। নায়ক পড়াশোনার জন্য শহরে আসে এবং দুমাস পরে সে তার স্ত্রী রাবেয়ার মৃত্যু সংবাদ পায়। রাবেয়াকে সে ভুলতে পারে না। পরবর্তীতে সখিনার সাথে বিয়ে হলেও সখিনাকে সে ভালোবাসতে পারে না। বিয়ের এক মাস পরে সখিনাও মারা যায়, এর পরে সে তার মাকেও হারায়। স্বজন বিয়োগ ব্যথা ভুলতে সে মদ পানে আসক্ত হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ আত্মীয়-স্বজনবিহীন এই বাউন্ডুলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে যোগদান করে।

মেহের নেগার

গল্পটি আফগানিস্তানের পটভূমিতে লেখা এক ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি। নায়ক ওয়াজিরিস্তানের যুবক য়ুসোফ। কৈশোরের ভালোবাসা মেহের নেগার হারিয়ে গেলে তার অনুসন্ধানে এসে ঝিলিম নদীর তীরে দেখা পায় গুলশানের। গুলশানের মধ্যে সে মেহের নেগারকে খুঁজে পায়। উভয়ের মিলনে বাঁধা হয়ে উঠে গুলশান; বাঈজীর মেয়ে গুলশান সামাজিক দায়বদ্ধতা বশত প্রেমর পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। গুলশান য়ুসোফের ভালোবাসাকে অপবিত্র করতে চায় না, তাই সে আত্মহত্যা করে। অন্যদিকে যুসোফ প্রেমে ব্যর্থ হয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গুলশানের আত্মহত্যা সামাজিক নগ্ন সংস্কারকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। গল্পকার নায়ক য়ুসোফ ও নায়িকা গুলশানের চির বিচ্ছেদের কাহিনিকে বেদনাবিধুর করে তুলেছেন।

ঘুমের-ঘোরে : গল্পটিতে নায়ক নায়িকার মিলন ঘটেনি। গল্পের নায়ক আজহার একজন যোদ্ধা, যে দেশের জন্য যুদ্ধ করে। আফ্রিকার মরু অঞ্চলের সে তার ক্যাম্পে বসে পূর্ব প্রেম স্মরণ করেছে। যেহেতু গল্পের নায়ক যুদ্ধের ময়দানেও প্রেমকে স্মরণ করতে পেরেছে, তাই সে তার পূর্ব প্রেমকে ব্যর্থ বলে মনে করেনি।

কল্পনা প্রধান গল্প

সাঁঝের তারা : সাঁঝের তাঁরা নজরুলের কল্পনাপ্রধান প্রেমের গল্প। গল্পে দেখা যাচ্ছে এক সৈনিক কবি আরব সাগরের বেলা ভূমিতে একটি পাহাড়ে বসে প্রেমিকাকে স্মরণ করছে। সাঁঝের তারার মধ্যে কল্পনায় মানস প্রিয়াকে সন্ধান করছে সে । তার প্রেমহীন জীবন রিক্ত হয়ে উঠেছে। কেননা ভৌগোলিক দিক থেকে অনেক দূরে অবস্থান প্রিয়ার। এমন অবস্থায় কল্পনার আলোকে প্রিয়াকে অনুভব করতে চেয়েছে নায়ক। এখানে

নায়কের ভাগ্য বিড়ম্বিত মনোবেদনাকেও তুলে ধরা হয়েছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে। গল্পটির প্রকৃতি অনেকটা রূপকধর্মী কথিকার মত।

দুরন্ত পথিক

এই গল্পে দেশাত্ববোধে উদ্বুদ্ধ এক আদর্শ যুবকের কথা তুলে ধরা হয়েছে। দুরন্ত-পথিক এমন এক যুবক যে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত নয়, শেষ পর্যন্ত সে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। এই গল্পে রূপকের ছলে নজরুল তরুণদেরকে আহ্বান করেছেন, তাদেরকে দেশের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যুবশক্তি দেশের কল্যাণের জন্য জীবন দিতেও পিছপা হবে না। এখানে লেখকের সংগ্রামী চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে।

সামাজিক ও লোকপ্রচলিত কথার বিনির্মাণধর্মী গল্প

রাক্ষসী

নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প রাক্ষসী। বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে অভিনব বলা যায়। গল্পের ভাষা ও কাহিনি বীরভূমের বাগদীদের সমাজে প্রচলিত কথা থেকে নেওয়া হয়েছে। গল্পের নায়িকা বিন্দি, স্বামী-সন্তান নিয়ে তার সংসার। বিন্দি পতিগতপ্রাণা। বিন্দির স্বামী রঘু একজন সোজা সরল মানুষ। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে পাড়ারই এক তরুণীর সাথে পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। সংসারে অশান্তি শুরু হয়, রঘু সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। মাঝে মাঝে ঘরে এসে বিন্দির কষ্ট করে উপার্জিত টাকা নিয়ে ওই মেয়েকে দিয়ে দেয়। হঠাৎ একদিন দেখা গেল রঘু বিন্দিকে নিঃস্ব করে পাড়ার ওই মেয়েকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করে। সেদিন বিন্দি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। সে ক্ষিপ্ত হয়ে দা দিয়ে আঘাত করে স্বামীকে খুন করে। সাত বছর জেল হয় তার, জেল থেকে বেরিয়ে এলে সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি, বরং তাকে রাক্ষসী বলে সম্বোধন করে। বিন্দিকে একঘরে করে দেওয়া হয়। তার মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায় না। একদিকে স্বামী হত্যার শোক, অন্যদিকে সামাজিক অপবাদ বিন্দিকে মানসিক বিকৃতির দিকে ঠেলে দেয়।

এই গল্পে গল্পকার যেমন সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেছেন, তেমনি উঠে এসেছে সমাজ চিত্র। লোকভাষা ব্যবহার গল্পটির বিশেষ আকর্ষণ। গল্পকার বিন্দির মানসিক অবস্থা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন।

স্বামীহারা

স্বামীহারা নজরুলের সামাজিক গল্প। অনেকটা রাক্ষসী গল্পের মত এর সমস্যা। নায়িকা বেগম, গরিব ঘরের মেয়ে; কিন্তু তাঁর বিয়ে হয় ধনী গৃহে। আদর্শবান স্বামী তাকে প্রাণভরে ভালোবাসে। গরিবের মেয়ের এই সুখি জীবন প্রতিবেশীদের লাঞ্ছনা, গঞ্জনায় দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। প্রতিনিয়ত চরম প্রতিকুল পররিবেশের সাথে বেগমকে লড়াই করতে হয়। এই সামাজিক আঘাত তাঁর জীবনকে বেদনাসিক্ত করে তোলে। গল্পে স্বামীর অকাল মৃত্যুতে বিধবা শোকাতুরা স্ত্রীর দীর্ঘশ্বাস, দাম্পত্য জীবনের সুখস্মৃতির কথা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি গ্রামের মানুষের সামাজিক নীচতার চিত্রও ফুটে উঠেছে। গল্পের সমস্যার মধ্যে আশরাফ আতরাফের ভেদাভেদও পরিস্ফুটিত হয়েছে।

গল্পে স্বামীর অকাল মৃত্যুতে বিধবা শোকাতুরা স্ত্রীর দীর্ঘশ্বাস, দাম্পত্য জীবনের সুখস্মৃতির কথা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি গ্রামের মানুষের সামাজিক নীচতার চিত্রও ফুটে উঠেছে। গল্পের সমস্যার মধ্যে আশরাফ আতরাফের ভেদাভেদও পরিস্ফুটিত হয়েছে।

পদ্ম-গোখরো

গল্পের কাহিনি অবিশ্বাস্য ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হবে। দুটি সাপের সাথে জোহরার মাতৃহৃদয়ের অপত্যস্নেহের সম্পর্ক এখানে দেখানো হয়েছে। গরিব ঘরের মেয়ে জোহরা; পড়ন্ত খানদানি বংশে বিয়ে হয়েছে তার। সংসারে জোহরা বউ হিসেবে আসার পরে সংসাররের চেহারা পাল্টে যায়। অসুস্থ শাশুড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন। একদিন দেয়ালে এক ফাটল দেখা দিলে জোহরা তা লাঠি দিয়ে পরখ করতে গিয়ে বাদশাহী আশরাফির সন্ধান পায়, তার সাথে পদ্মগোখরো সাপ, পদ্মগোখরো সাপ বলে সাপ দুটিকে মারা হয় না, বরং তাদেরকে লালন পালন করার বন্দোবস্ত হয়। কালক্রমে সাপ দুটি জোহরার খুব অনুরক্ত হয়ে পড়ে। বিয়ের এক বছরের মধ্যে জোহরার দুটি যমজ সন্তান আঁতুড়ে মারা যায়; এই অবস্থায় জোহরা এই দুটি সাপের মধ্যে তার মৃত যমজ সন্তান দুটিকে প্রত্যক্ষ করেছে। তাই জোহরা ওদের খোকা বলে নিজ হাতে দুধ খাওয়ায়। কিন্তু একদিন জোহরার বাবা সাপ দুটিকে মেরে ফেলে। এই মৃত সাপের শোকে জোহরাও মৃত্যু বরণ করে। গল্পটি পাঠকের মনে এক দীর্ঘস্থায়ী রেশ রেখে যায়। জোহরার মাতৃহৃদয়ের হাহাকার। এখানে অলৌকিকতা ও অবিশ্বাস্যতা থাকলেও, নারী-মনস্তত্ত্বের মহৎ রূপায়ণ গল্পটিকে সার্থক করে তুলেছে। গল্পের উপস্থাপনে নাটকীয়তা ও ভাষার গাঁথুনি যথেষ্ট উপভোগ্য হয়েছে।

> বিবাহের পাঁচ বছর পরেও এই দম্পতি নিঃসন্তান। বাড়ি গাড়ি চাকরি সম্পত্তি সব কিছুই রমলার বাবার দান। সেজন্য মি. মিত্রকে অনেক সময় রমলাকে ভয় করে চলতে হয়। অভিমানিনী স্বামীর উপরে রাগ করে পদ্মার তীরে চলে গেলে চন্দ্রালোকিত রাতে হঠাৎ একটি আহত পাখি রমলার বুকে এসে পড়ে। পাখিটিকে রমলা বাড়িতে আনে এবং সুস্থ করে। দিনের পর দিন পাখিটির সাথে রমলার যত সখ্যতা বাড়ে ততটাই দূরত্ব বাড়ে মি. মিত্রের সাথে।

জিনের বাদশা

জিনের বাদশার মধ্যে ফরিদপুরের আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর অঞ্চলের কাহিনি স্থান লাভ করেছে। আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরে মোহনপুর গ্রাম। সেই গ্রামের মাতব্বর চুন্নু ব্যাপারী। তার তৃতীয় পক্ষের ছেলে আল্লা রাখা গল্পের নায়ক। আল্লা রাখা অলস অকর্মণ্য ও বিলাসী ছেলে। সে প্রেমে পড়ে গ্রামের নারদ আলির মেয়ে চান ভানুর। এই প্রেমের পটভূমি পুঁথি পাঠের মধ্যে নিহিত। পুঁথি পাঠ করতে গিয়ে আল্লারাখার মনে হয়েছে, গ্রামের সুন্দরি মেয়ে চান ভানু যদি সোনাভান হয় তাহলে সে হবে হানিফা গাজী। সে হানিফা গাজী সেজে নানা ছলে চান ভানুকে বিয়ে করতে চাইলেও চান ভানুর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। তার প্রেম ব্যর্থতার কারণ সে বুঝতে পারে, সে নিজের স্বভাবের পরিবর্তন আনে। তার পোশাক চুল সব কিছুতে পরিবর্তন ঘটে, কাজে মনোযোগী হয় সে। তাঁর পরিবর্তনের জন্য পরিবারের লোকেরা খুশি হয়। গল্পের এই বিরহ ও বেদনাময় পরিণতি পাঠকের মনে করুণ রসের সঞ্চার করে। নামকরণের মধ্যেও বিশেষ শৈল্পিক ব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায়।

অগ্নিগিরি

অগ্নিগিরি গল্পের নায়ক সবুর, সহজ সরল ছেলে। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা তাকে দিনরাত অন্যায় ভাবে খেপাত। কিন্তু তার কোনো প্রতিবাদ সে করতে পারত না। সহসা একদিন তার ছাত্রী নুরজাহানের খোচায় সবুরের পৌরুষত্ব জেগে ওঠে, হয়ে হয়ে ওঠে সে প্রতিবাদী। তার প্রতিবাদ যেন এবার সুপ্ত আগ্নেয়গিরি থেকে তপ্ত লাভার মত অগ্নুৎপাত ঘটায়। পাড়ার ছেলেরা তাকে জ্বালাতন করতে আসলে সে রুখে দাঁড়ায় এবং তার রোষের প্রকোপে পড়ে এক ছেলে মারা যায়। যার ফলে সবুরকে জেলে যেতে হয়। গল্পের শেষের অংশটি পাঠ করতে গিয়ে অশ্রুসিক্ত হতে হয় নূরজাহানের দুঃখে। নুরজাহানের মনে হয়েছে সবুরের জেলবন্দি হওয়ায় তার সুখের দরজাও যেন চির দিনের মত বন্ধ হয়ে গেল। প্রেমের এই বিষাদময় পরিণতি গল্পটিকে এক অন্য সৌন্দর্য দান করেছে।

বিবিধ : তিনটি গল্পগ্রন্থের বাইরে আরও দুটি গল্প পাওয়া যায় যেগুলি পরবর্তীতে নজরুল রচনাবলীতে সংকলিত হয়েছে। গল্প দুটি হল বনের পাপিয়া, হারা ছেলের চিঠি।

এটিও একটি প্রেমের গল্প। গল্পের নায়িকা রমলা, নায়ক ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মি. দুঃশাসন মিত্র। গল্পের নায়িকার স্বামীকে নিয়ে সুখেই থাকার কথা। কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তাদের। কিন্তু তাঁর খেয়ালী আচরণ, অতৃপ্তি ও অপ্রাপ্তি জনিত শূন্যতায় নারী হৃদয়ের এক বিচিত্র ছবি ধরা পড়েছে। বিবাহের পাঁচ বছর পরেও এই দম্পতি নিঃসন্তান। বাড়ি গাড়ি চাকরি সম্পত্তি সব কিছুই রমলার বাবার দান। সেজন্য মি. মিত্রকে অনেক সময় রমলাকে ভয় করে চলতে হয়। অভিমানিনী স্বামীর উপরে রাগ করে পদ্মার তীরে চলে গেলে চন্দ্রালোকিত রাতে হঠাৎ একটি আহত পাখি রমলার বুকে এসে পড়ে। পাখিটিকে রমলা বাড়িতে আনে এবং সুস্থ করে। দিনের পর দিন পাখিটির সাথে রমলার যত সখ্যতা বাড়ে ততটাই দূরত্ব বাড়ে মি. মিত্রের সাথে। সে কারণে মি. মিত্র পাখিটিকে পছন্দ করে না এবং একদিন রমলার অনুপস্থিতিতে পাখিটিকে পদ্মার তীরে ছেড়ে চলে আসে। এ কথা শোনার পরে রমলা পাখিটির উদ্দেশ্যে পদ্মার তীরে ছুটে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত আহত পাখিটিকে বুকে নিয়ে পদ্মার বুকে আত্মবিসর্জন দেয় রমলা। আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে গল্পের শেষ, গল্পের এই বিষাদের সুর পাঠককে যথেষ্ট নাড়া দেয়।

নজরুলের গল্পের ভাব, বিষয়, গঠন, ইত্যাদিকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করলে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ —

১) গল্পের সৃজনশীলতার মধ্যে রয়েছে লিরিকধর্মীতা।

২) গল্পের আঙ্গিক, গঠন, চরিত্র নির্মাণ, ভাষা ব্যবহার, শিল্প সুষমায় ব্যতিক্রমী প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

৩) অনেক গল্পে সৈনিক জীবন, সমর পটভূমির জীবনকথা বিদ্যমান।

৪) বেশিরভাগ গল্পের প্রধান উপজীব্য বিষয় প্রেম

৫) গল্পের আঙ্গিকে আত্মকথন ও কথিকার রীতি লক্ষ করা যায়

৬) গল্পে আবেগের প্রাধান্য রয়েছে, যার ফলে চরিত্রদের মধ্যে অভিমানের প্রকাশ বেশি।

৭) গল্পকার নর-নারীর চিরন্তন প্রেম জাত বিরহ-বেদনাকে তিনি তুলে ধরছেন।

৮) গল্পে দেশ প্রেম ও আন্তর্জাতিকতা বোধের সন্ধান পাওয়া যায়।

৯) গল্পগুলিতে জীবনের প্রেম জড়িয়ে গেছে দেশ প্রেম চেতনায়, মা-মাতৃভূমি মুক্তির চেতনা।

১০) কবিসুলভ ভঙ্গীতে প্রেমের বিরহ-বেদনার স্মৃতি রোমন্থনের ইতিবৃত্ত লক্ষ করা যায়।

১১) গল্পে অনেক সময় প্রেম অপেক্ষা কর্তব্য অধিক গুরুপূর্ণ।

১২) ভালোবাসার জন্য নর-নারীর আত্মবিসর্জন।

১৩) সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন চিহ্ন।

১৪) কল্পনার জাল বিন্যাস

১৫) অতিনাটকীয়তা ও রূপকধর্মীতার ব্যবহার।

১৬) অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য কাহিনির ব্যবহার।

১৭) শিথিল প্লট, শিল্প সতর্ক সংগঠন শৈলীর অভাব।

১৮) বিচিত্র জীবনবোধ ও চিন্তাধারার প্রকাশ।

১৯) দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবনার স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত রূপ।

২০) বিদ্রোহ ঘোষণা।

নজরুলের গল্পগুলি তাঁর যৌবনের সূচনার ফসল। গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে নজরুলের সৃজনশীলতা ও সূচনা পর্বের গদ্যরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পগুলিতে দেশপ্রেম অন্য দেশের রূপকে এসেছে, প্রেমের বিবর্তন ঘটেছে নর -নারীর প্রেম দেশ প্রেমে, এবং মাতৃ প্রেম থেকে মাতৃভূমির প্রতি প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। পটভূমি নির্ণয় করতে গেলে পাওয়া যায় যুদ্ধ ও বিদেশী পটভূমি, রাঢ়বঙ্গ, কলকাতা এবং পূর্ব বাংলা। গ্রামজীবন কেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে সজীবতা ও মাটির ঘ্রাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে শহর-নগর ও যুদ্ধের গল্পগুলির মধ্যে কৃত্রিমতা প্রকটে জীবন্তভাব বিঘ্নিত হয়েছে। আত্মকথনরীতির লিরিকধর্মীতা এবং আবেগের প্রাধান্য চরিত্রগুলি বিকাশে অন্তরায় হয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব কিংবা অন্তর্ঘাত এর বিশ্লেষণ খুব একটা নেই। পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রগুলি অনেক জীবন্ত এবং চিত্তাকর্ষক। তাঁর সব গল্পকে ছোটগল্পের আঙ্গিকে ফেলে বিচার করলে নজরুলের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে ধরা পড়বে। কিন্তু গল্প হিসাবে পড়তে গেলে রস আস্বদানে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সব মিলিয়ে বলা যায় বাংলা সাহিত্যের সাপেক্ষে নজরুলের গল্পের যে স্বতন্ত্রতা রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সা’আ দু ল ই স লা ম

চিকেন চরু

আমি ত্রিভুবন ঘুরে চলে গেছি মেসোপটেমিয়া
আক্কাদীয় সুন্দরীর চিবুক ছুঁয়েছি
দেখেছি গিলগামেশের বলদবাহন রাজাকে
দেখেছি রাজা বিলগামেশের দরবারে পাঁচ কবি
লিখছেন, লেখা হচ্ছে মহাকাব্য গিলগামেশ

পার হয়েছি ঘোড়ার পিঠে পামির হিন্দুকুশ
সিন্ধুতীরে হরপ্পার সেই সুতন্বী কালো মেয়েটির
কোমরে হাত রাখা বিভঙ্গ দেখেছি, দেখেছি দূরে নিবদ্ধ দৃষ্টি তার,
গ্রীবা উঁচু করে দেখেছে সে ঘোড়া ছুটিয়ে আসা আমাকে
কাছে এসে চোখে চোখ রেখে তর্জনী ছুঁয়ে তার হাতের উলটো
দিকে চুমু এঁকে দিয়ে
গুহায় দাঁড়ানো সীলের মহাকুকুদ ষাঁড়টির কুকুদে হাত বুলিয়ে
গলকম্বলে একবার ঢেউ তুলে দিতেই সে আদরখেকোর মতো
লেজ তুলে ধরলো আলতো করে,
আমার দিকে শান্ত তাকালো, সহর্ষ।

চলি রে —বলে বিদায় নিয়ে চলে যাই আরো উপরপানে
বরফকঠিন হিমসাগরে এসে দেখলাম
গলায় সাপের মালা, কপালে তৃতীয়া চাঁদের টিপ পরে
শিংওয়ালা এক্কেরে গোবেচারা একখান
বলদ চড়ে আসছেন বাঘছাল-পরা শিবঠাকুর
পেছনে ওরা নন্দীভৃঙ্গীর দল ঢোল-কাঁসি- মাদলে মাতোয়ারা,
বিয়ে বসবেন শিবঠাকুর।

গিলগামেশের লেজউঁচু বলদ আর বিরাট কুকুদঝাঁকা শিবের বলদ
কেউ গুঁতোগুঁতি করলো না।
সরোবর মানসের পাড়ে নন্দনের বনে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায় তারা
দীর্ঘদেহী পত্রমোচী দেবদারুর গায়ে গা ঘষলো দুজনে

একসময় নির্নিমেষ চেয়ে থাকে তারা কোন দিকে ?
এখানে তো গাভী নেই গাভীন হবার,
আরে ! দ্যাখো দ্যাখো,
নগ্নদেহী নারীলতা ফুল ফুটেছে, নাম তার লিয়াথামবারা
কুড়ি কুড়ি বছরের পার, যেন উদোম যুবতী !
সেগুলো কি দ্যাখে ওরা ?
আদুল যুবতী ঝুলে আছে গাছের ডগায় স্তনস্তবকাবনম্রা
ওরা কি বলদ নয়, তবে ষাঁড় ?
কুমারী ছিনাল কামধেনু, নিদেনপক্ষে দুগ্ধবতী গাভী
খুঁজে খুঁজে হয়রান মহাষণ্ডা বাবা যে !
নগ্না নারীশরীরে কি ষাঁড়ের অবগাহন সাজে ?

অশোকের ধূসর মগধে শিলার পাথরবুকে
সিংহ বলদ ঘোড়া আবার শুঁড়েলা হাতিও
সিংহের বাঁকানো নখের থাবার পাশেও
গভীর প্রশান্তি মেখে দাঁড়িয়ে সুঠাম
আর মধ্যচাকায় গড়িয়ে চলে মহা ভারতের অলাতচক্র
তবু চলমান স্থিরতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে থির
সহাবস্থানের আর সম্প্রীতির অমোঘ নিয়তিলিখন

ভুলে বাগদাদ মেসোপটেমিয়া, মুছে সিন্ধুতীর মহেঞ্জোদারো
যুগ যুগ ধরে কত-না মিথেন মিশিয়েছো, হে মানুষ !
বোমা ও অস্ত্র হাতে জিগীষায় হননে মেতে
কী-বা পেলে বলো ?
শুধু মিথেন ছড়াওনি, ছড়িয়েছো ঘৃণা-বিষ
অতএব, দম বন্ধ হতে হতে ক্রমে ঘড় ঘড়, তারপর একদম চুপ
যতই বলি সরো না, করোনা শোনে না কথা
শুধুই দেখায় ভয়, গলা টিপে ধরে তারপর দুনিয়াজুড়ে নিথর
নিশ্চুপ
...আমি কি এখন গলাকাটা চিকেন চরু ?

পোল্ট্রি ফার্মে কাটিয়ে গলা পালকসুদ্ধু ছালওল্টানো চিকেনমিশ্র চরু !

তবু, এই কোয়ারেন্টাইন, এই দূরে থাকা শেষ হলে
কলজের শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে সব ছুলে-ফেলা লোম অনুলোম
আকাশ ফাটিয়ে বলতে চায়— আমার এ দেশ আমার ভুবন
এদেশেই জগৎ দেখি, দেখি ত্রিভুবন !
যতই শূন্য করে দাও তবু আমি যে
পালকসুদ্ধু ছালওল্টানো চিকেনচরু...
একই কথা বলবে
সিংহ বলদ ঘোড়া ও হাতির আর মানুষের

অমোঘ এ সহবাসের নিয়তিলিখন !

(বাঙালির বইপড়া থেকে চয়ন)

ফা হি ম হা সা ন

যে কবিতা প্রকাশ যোগ্য নয় !

১.
সূচিপত্রে নাম নেই বলেই আনুষাঙ্গিক কবিতা লেখা ছেড়ে দেবো... ! এতটা স্বার্থপর হতে পৃথিবীও শেখাইনি আমায়....
২.
শব্দের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহার জানি না বলেই..... মাধুরীর গান....
কি ভীষণ আর্তনাদ শোনায়..... !
৩.
তোমার ভালোবাসা না হই
অবহেলা আর প্রত্যাখ্যান হতে দিও....
এটুকুতে
তুমি আমায় বঞ্চিত করতে পারবে না...
৪.
সহ্য করতে পারবে শরীর ভর্তি পোড়া দাগ ছাই গন্ধ!?
বলো..... তাহলেই আলিঙ্গন করবো তোমাকে.... !
৫.
সম্পর্ক ছিল। সম্পর্ক নেই।
এখন যা কিছু.... একটি " সাময়িক" গল্পের নামকরণ... !
৫.
যে আগুনে দগ্ধ হলাম
সে আগুনেই শুদ্ধ হবো

মনে রেখো, অঙ্গার ভেবেছিলে !
৬.
আমার শরীরে আজ বহুবিধ বৈষম্য লেগে আছে
এভাবে কাউকে ভালোবাসা যেতে পারে না।
৭.
কাকে দোষারোপ করি? সকলেই ধর্ম ছুঁয়ে বিরুদ্ধ স্বীকারোক্তি দিয়েছে !
আর
যার প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই
সেই নির্দোষ আসামি চিহ্নিত
দুহাত শূন্যে ক্ষমা প্রার্থীর অভিনয়ে কাঠগড়ায়....
৮.
কেউ নিজেকে নির্দোষ বলতে পারে না
আংশিক সকলেই অপরাধের সাক্ষী ছিল....
ঈশ্বর তুমিও !
৯.
অসহায় কিশোরীকে ভিক্ষা করতে দেখে
তোমার কি কষ্ট হয়েছে?
যদি হয়
তাহলে এখনই অর্ধ নিহত বিবেক কাছে নতজানু হও...
১০ .
শহীদ মিনারের মতো নিশ্চল
মূর্তি হতে চাই না
যে প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছে !
তা চেয়ে বরং মোমবাতি হাতে
শোকযাত্রার মিছিলে পদধূলি হয়েছি....
১১.
তোমার ভূমিকা হয়েছে অন্য কেউ !
যদি সম্মতি দাও
তোমার উপসংহার হই?
১২.

অভিমান!
সে অনেকটা দূরত্বের ব্যবধান !
১৩.
(এপিটাফ)
যেদিন প্রস্থান করবে
আমাকে মঞ্চে রেখে একা!

অনেকটা অন্ধকার ছায়ার মতোই
সেদিনই যবনিকাপাত!

নাট্যাভিনয় শেষ!
১৪.
(আকাশ)
আমি আজ দূরত্ব হয়েছি
হয়েছি অগনন ডানার নির্দেশ
একদা যে সুদুর অতীত থেকে
সেখানে তুমি চেয়ে থাকতে অনিমেষ!
১৫.
ভুলে যেতেই পারো!
মনে রাখার স্পর্ধা -
আজ তোমার অধিকার ছিন্ন বলেই
মনে করো দুঃস্বপ্নের মেঘই ছিলাম!
১৬.
দায়বদ্ধ প্রবঞ্চনাকে মিথ্যা করে দাও
যদি আমাকে স্লোগান করতে পারো
অধিকার ছিনতাই করে আনো
যদি আমাকে মিছিল করতে পারো!

যদি আমাকে সত্য করে দাও!
১৭.
(শেষাংশ)
তুমি কার জন্ম দাও?
তুমি কার অবৈধ শিশু?
ভুলে ভালোবাসতে পারো?
জানো, আমার হৃৎপিন্ড গেঁথে ক্রুশবিদ্ধ যিশু!
(কবি একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত)

বিমান পাত্র
আরশোলা

ভিড়ে ঠাসা রাস্তায়
সকালে ছেলেকে নিয়ে
বেরিয়েছিলাম বাজারে ।
হঠাৎ ছেলে চমকে উঠে
আঙুল উঁচিয়ে বলে ,
'ঐ দ্যাখো বাবা , আরশোলা !'
আমি দেখলাম , দুচাকা আর চারচাকার
মরণ চুমু-কে ম্যাজিকের মতো
পাশ কাটিয়ে কেমন করে খুদে আরশোলাটা
একটা গোটা রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে ।
নিজেকেই , নিজের বেঁচে থাকাকেই
শহরের আয়নায় আরেকবার দেখে নিলাম !

সাঈদ আনোয়ার
মর্টগেজ

ঘুনধরা দড়িটার ভেতরে এখন -
জলজ শ্যাওলা ,
গুচ্ছ চিঠির অন্তঃভাগ ,
তিরবিদ্ধ বুকে-হাঁটা বিষাক্ত বৃশ্চিক ,
জ্বলন্ত সমুদ্রের যন্ত্রণা -
জীবন বঞ্চিত এক ভোরে ওই দড়িটার ভেতরে লুকিয়ে আছে।

বুকের উভয় অলিন্দের স্থির প্রত্যয় -
পোস্টমর্টেমের সুগন্ধি তারা গিলে নেবে।
কাক-ভাঙা ভোরে অনেক ছিন্ন জীবনের দেখা মিলেছিল
তাই ঋণশোধ করে এ পথে দেহ দিতে হল - এখানেই
ক্রমমুক্তি।

উপন্যাস

সেখ রফিকুল ইসলাম

ঘূর্ণাবর্ত

৭ : সম্পর্ক সূত্রের ইতিকথা

সনৎ বাবুর বাড়ী থেকে ফেরার পর থেকেই আমাদের মনে একটি প্রশ্ন খচ খচ করছিল। কি কারণে– সনৎবাবুর বাড়ীতে রতন- কনকের বাবাকে দেখা গেল ও শুধু তাই নয়, কোন সম্পর্কের টানে দুপুরের আহার সারতে হয়েছিল? এমন কী তরুণ স্যারই বা সনৎ বাবুর বাড়ীতে হাজির হলেন কেন? এই সম্পর্ক সূত্রগুলির উত্তর কী?

দুপুরের স্নানাহার সেরে দিবানিদ্রা আর এলো না। বিকালে খেলার মাঠে প্রাত্যহিক রুটিন ভঙ্গ হল। কারণ– খেলার মাঠও কর্দমাক্ত।

সজ্ঞয় বললে, চল একটু পুকুর পাড় দিয়ে ঘুরে আসি। আধা কিলোমিটার হেঁটে পুকুর পাড়ে এসে গাছ তলায় বসলাম। দেবাশীষ- দশ পয়সার তিনটে চারমিনার সিগারেট বের করলো। সিগারেট ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘুরে ফিরে সেই একই প্রসঙ্গ এসে হাজির হচ্ছে। কিন্তু এর উত্তর কার কাছেই বা পাওয়া যাবে? —দেবাশীষ চিৎকার করে বললে ইউরেকা– ইউরেকা, পেয়েছি, পেয়েছি।

আমি- কী পেয়েছিস? চিৎকার করে উঠলি কেন?

দেবাশীষ– পেয়েছি পেয়েছি, আমরা যে প্রশ্ন নিয়ে এতক্ষণ ধরে ভাবছি তার সমাধানের রাস্তা খুঁজে পেয়েছি।

সজ্ঞয়– সমাধানের রাস্তা? কোথায়?

দেবাশীষ– চল- এখুনি চল। তরুন স্যার কে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো- উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

৮: ইতিকথা (দুই)

সূর্য্য তখন প্রায় ডুবুডুবু । আমরা গুটি গুটি পায়ে পুকুর পাড় থেকে হোস্টেলে এস হাজির হলাম।

তরুন স্যারের রুমে দরজা তখনও বন্ধ। বোঝা গেল উনি এখনও হোস্টেলে ফেরেননি।

আমরা একগ্লাস করে হরলিকস আর দুটি বিস্কুট দিয়ে টিফিন সেরে সবে মাত্র পড়তে বসেছি- দেখি তরুনবাবু হোস্টেলে এসে ঢুকলেন। হাত- মুখ ধুয়ে নিজের রুমে ঢুকতেই দেবাশীষ বললে– চল স্যারের ঘরে যাবি?

সজ্ঞয় ও আমি বললাম—তবে চল।

দেবাশীষ – স্যার- আসবো?

তরুন স্যার– আয়

দেবাশীষ– স্যার- একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল।

তরুন– বল- কী কথা?

সজ্ঞয়– ঐ কনক- রতনের বাবার সাথে সনৎবাবুর সম্পর্কের সূত্রটা ঠিক কী? আমাদের ঔৎসুক্য দেখে তরুনবাবু কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করলেন। হয়তো উনি ভাবছেন এই তিনটি কিশোরের কাছে, এসব কথা বলা উচিত হবে কি না। কিংবা হয়তো অতীত ইতিহাস খুঁজতে একটু সময় লাগছে। যাইহোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন— দেখ আজ আমি একটু ক্লান্ত, তোরা বরং কাল আসিস, স্কুলতো কালকেও বন্ধ থাকবে। বিকালের দিকে কাল একটু ফ্রি থাকবো তখন না হয় এ বিষয়ে কথা বলবো।

যাইহোক তরুন বাবুর কাছে এই প্রশ্নের উত্তর তাহলে পাওয়া

আগের দিনের কথা মত বিকেলে আমাদেরকে প্রিন্সপালের কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন। কোয়ার্টারের গেট বন্ধ করে সতরঞ্চি বিছিয়ে মুখোমুখি বসলেন। তরুন স্যার—কালকে তোরা যে বিষয়টা জানতে চেয়েছিলি– তার একটা দীর্ঘদিনের বিস্তৃত ইতিহাস আছে। যার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিতে গেলে হয়তো কয়েক দিন লেগে যাবে।

যাবে। দেবাশীষের প্রেডিকসন তাহলে ভুল ছিল না। এই কথা ভাবতে ভাবতে আমারা রুমে ফিরে এলাম।

৯ : ইতিকথা (তিন)

আমাদের স্কুল ক্যাম্পাসের উত্তরে সংলগ্ন কলেজ ক্যাম্পাস। স্কুল ক্যাম্পাসের পশ্চিমে হোস্টেল ক্যাম্পাস। তার পশ্চিমে অনতিদূরেই কলেজ পিন্সপালের কোয়ার্টার। হেঁটে গেলে ক্যাম্পাস, কলেজ এবং প্রিন্সপালেব কোয়ার্টারের দু-মিনিটের দূরত্ব। ফলে প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে আমাদের সখ্যাতা গড়ে উঠেছিল। কোয়ার্টারে পেয়ারা পেঁপে আমের স্বাদ নিতে প্রিন্সপাল স্যার আমাদের আমন্ত্রণ জানাতেন। প্রিন্সিপাল স্যার দিন কয়েকের জন্য ছুটিতে দেশের বাড়ী গিয়েছেন। কোয়ার্টারের চাবি তরুন স্যারের কাছেই রেখে যেতেন– এবং সে কদিন তরুন স্যার ঐ কোয়ার্টারে অনেকের সাথেই আলাপ- আলোচনা করতেন। কে বা কারা আসতেন, কি বিষয়ে যে আলোচনা হত তা আমাদের অজানা।

আগের দিনের কথা মত বিকেলে আমাদেরকে প্রিন্সপালের কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন। কোয়ার্টারের গেট বন্ধ করে সতরঞ্চি বিছিয়ে মুখোমুখি বসলেন। তরুন স্যার—কালকে তোরা যে বিষয়টা জানতে চেয়েছিলি– তার একটা দীর্ঘদিনের বিস্তৃত ইতিহাস আছে। যার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিতে গেলে হয়তো কয়েক দিন লেগে যাবে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কী ঘটনাক্রম, তার অভিঘাতই বা কী ছিল, এটা তোদেরকে আজ হয়তো বোঝাতে পারবো না। তবে যতটা সম্ভব চেষ্টা করছি।

তরুন স্যার : কনকের বাবা অমল মুখার্জী, সইদুল তথা রতনের বাবা মোস্তফা কাজী, মৌসুমীর বাবা সনৎ ভট্টাচার্য্য এরা সহপাঠী এবং বামপন্থী মতাদর্শের পথিক। স্বাধীনতা আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন, তারপর সম্প্রতি কৃষক আন্দোলনে এরাই এলাকার নেতা, কর্মী সংগঠক। গতকাল যে তোরা চাল, ডাল, অর্থ সংগ্রহ করেছিলি তা ওদেরই পরিকল্পনা। পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্কুলে ও বারোয়ারীতলায় খিচুড়ী রান্না করে দুঃস্থ মানুষদের মুখে দুটি অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য লঙ্গরখানা খুলেছিলেন। সারাদিন ধরে গ্রামের যুবকদের নিয়ে রান্না, খাবার বিতরণ ও তার জন্য প্রয়োজনীয় সংগৃহীত অর্থের যোগান ও বন্টন করেই তো কাল সারাদিন কেটে গেল। সেদিক থেকে আমিও কিছুটা সহযোগিতা করেছি।

এরা ১৯৫৯ সালে খাদ্যের দাবীতে যেমন কলকাতার রাজপথে হেঁটেছিলেন, তেমনি ১৯৬২ সালে চীন- ভারত যুদ্ধের সময় অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য হওয়ার সুবাদে দেশদ্রোহী তকমাও জুটেছিল। সেই সময় গোয়েন্দা বিভাগ আইবির নজর এড়াতে মাস ছয়েক আত্মগোপনও করেছিল। ঐ সময়ে তুলনামূলকভাবে মোস্তফা কাজীর গ্রামটি নিরাপদ ছিল। তাই কনকের বাবা ও মৌসুমীর বাবা রতনদের বাড়ীতেই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। দিনের দিকে বাড়ীর ভিতরেই স্নানাহার, রত্রি হলে বিশ্বস্ত কিছু মানুষের বাড়ী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা, দিনের দিকে গ্রামে ঢোকার রাস্তার উপর নজরদারির জন্য দুই চার জন বিশ্বস্ত অনুচর রাখা হত।

রতনের বাবার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল, কুড়ি পঁচিশ বিঘা ধানী জমি, দুই তিন বিঘা দো ফসলি জমি যাতে আলু, গম, সব্জী চাষ ভালই হত।

বলা যায় আত্মগোপনকালীন অমলবাবু ও সনৎবাবুর সংসারের যাবতীয় আর্থিকভার মোস্তফা কাজী নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। রাতের অন্ধকারে বিশ্বস্ত চাকর মারফৎ চাল-ডাল, সবজী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতেন। কখনও কখনও রতনের মারফৎ নগদ টাকাও পৌঁছে দিতেন। বলা বাহুল্য কনকের বাবা গ্রামের কোয়াক ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু ঐ সময় কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর মৌসুমীর বাবা ছিলেন পার্শ্ববর্তী

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার। তখন প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টারদের বেতন এতই কম ছিল যে শুধুমাত্র প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টারীর চাকরী থাকলে সেই পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী জুটতো না।

তারপর স্থলচলে যুদ্ধ থেমে গেলে, পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে আসেন। কিন্তু বামপন্থী আদর্শের রক্ষী হিসাবে তাঁদের কর্মোদ্যেগে কখনও ছেদ পড়েনি। পরবর্ত্তী পর্যায়ে- পশ্চিম বাংলায় আটের দশকের শেষের দিকে বেনামী জমির উদ্ধার এর আন্দোলন, খাস জমির দখলের আন্দোলন, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। কৃষকসভার নেতৃত্বে- গরীব মানুষকে সংগঠিত করে আন্দোলনে সামিল করার কাজেও এঁরা যুক্ত ছিলেন। ফলে এলাকার জোতদারদের রোষের মুখে পড়েছিলেন। যে কোন অজুহাতে-এদের কে পর্যদুস্ত করার জন্য নানান ভাবে চেষ্টা চলছিল।

তবে রতনদের গ্রাম এবং কনকদের গ্রাম দুটি সংগঠনগত ভাবে শক্তিশালী হওয়ায় এঁদের দুজনের উপর দাঁত ফোটানো সহজ ছিল না। কিন্তু সনৎবাবুর গ্রামেতেই বড়ো জোতদার বা ভূস্বামীর বাস। এলাকয়া তাদের বেনামী জমি ও খাস জমিই ছিল বেশী। অপেক্ষাকৃত সংগঠন দুর্বল থাকায় সনৎবাবুর উপর আক্রমণ করা সহজ ছিল। হঠাৎই সে সুযোগ জুটে গেল।

তবে রতনদের গ্রাম এবং কনকদের গ্রাম দুটি সংগঠনগত ভাবে শক্তিশালী হওয়ায় এঁদের দুজনের উপর দাঁত ফোটানো সহজ ছিল না। কিন্তু সনৎবাবুর গ্রামেতেই বড়ো জোতদার বা ভূস্বামীর বাস। এলাকয়া তাদের বেনামী জমি ও খাস জমিই ছিল বেশী। অপেক্ষাকৃত সংগঠন দুর্বল থাকায় সনৎবাবুর উপর আক্রমণ করা সহজ ছিল। হঠাৎই সে সুযোগ জুটে গেল। পাশের গ্রামের বাড়ীতে একটা ডাকাতি হল এবং যে ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি হল তাকে দিয়ে চক্রান্ত করে স্থানীয় থানায় অভিযোগ আনা হলো যে সনৎবাবুও এ ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ এসে সনৎবাবুকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। চোদ্দদিনের হাজত বাস আটকানো গেল না। পরে জামিন পেয়ে গ্রামে ফিরে এলেও প্রাইমারী স্কুলের চাকরী থেকে সাসপেণ্ড হয়েছিলেন। যদিও বেশ কয়েক বছর মামলা চলার পর উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে মামলা থেকে নিষ্কৃতি পান এবং চাকরীও ফিরে পান। ঐ সময় কালীনও কনকের ও রতনের পরিবার দুটি সনৎ বাবুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

আজও স্থানীয় গ্রামের মানুষজন এই তিনজনের কাছেই তাদের অভাব, অভিযোগ নিয়ে আসেন পরামর্শদাতা নেতা এবং অভিভাবক হিসাবে মান্য করেন। সে কারণে কেউ অসুস্থ হলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে, এমন কি কেউ মারা গেলেও তার সৎকার করার যাবতীয় উদ্যেগ এরাই গ্রহণ করেন। যা কালকেও তোরা লক্ষ করেছিস। আরও বহু ঘটনা এই তিনজন মানুষকে নিয়ে জড়িয়ে আছে। যা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। এই বলে তরুণ বাবু চোখ বন্ধ করে শ্বাস নিলেন।

এসব কথা শুনতে শুনতে আমাদের কারও মুখে আর কোন কথা ফুটছে না। বিস্ময়ে হতবাক। মনে মনে এই তিনটি মানুষের উপর-আমাদের শ্রদ্ধা বহু গুণ বেড়ে গেল। একই সঙ্গে রতন, কনক, মৌসুমীদের সম্পর্কে বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের আসল রসায়ন অনুভব করতে পেরে এবং আমরাও এই তিনজনের বন্ধু হতে পেরে গর্বিত মনে করছি।

এতসব বিশৃঙ্খলার মধ্যেও আমাদের এই পাঁচজনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে। আর আমাদের বন্ধুত্বের ঘেরাটোপেই এক সদৃশ্য সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে মৌসুমী তখন মুখ্যরানী। এ সময়কালে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মৌসুমীদের বাড়ীতে নেমতন্ন পেতাম। যেমন অরন্ধনের দিন, রথের মেলা, সরস্বতী পুজোয় আমরাও নারকেল নাড়ু খাওয়ার লোভেই বিজয়া দশমীর দিন বড়দের প্রণাম করতে যেতাম। ফলে রতন কনক তো বটেই– আমরা তিনজনও এক আত্বিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

১১তম অধ্যায়

প্রথম সালে ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। হায়ার সেকেণ্ডারীর রেজাল্ট বের হতে এখনও কম পক্ষে দেড় মাস দেরী। এবার ঘরে ফেরার পালা। ইতিমধ্যে আমরা (সঞ্জয়, দেবাশীষ, আমি) প্লান করেছি

সবার বাড়ী এক রাউন্ড বেড়িয়ে আসবো। সেই প্লান মোতাবেক রতনের কনকের বাড়ীতেও একদিনের জন্য বেড়াতে গিয়েছি। তেমনি পালা করে আমার বাড়ীতেও ওরা পাঁচজন দুদিনের জন্য বেড়াতে এসেছিল।

সবারই রেজাল্ট মার্কসিট নিতে আসতে হবে। সে কারণে বিছানা বইপত্র হোস্টেলে রেখেই যে- যার বাড়ী ফিরে গেছি।

বাড়ী ফিরে মন খারাপ। এতদিন ধরে হোস্টেলের অভ্যস্থ জীবন এবং দৈনন্দিন মেলামেশা ও সাহচর্যের রীতি মত অভাব ও কষ্ট অনুভব করছি।

হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করার সুবাদে নিজের গ্রামে সেভাবে বন্ধু- বান্ধব তৈরী হয়নি। যদিও সমবয়সী অনেকের সাথে চেনা- জানা থাকলেও তেমন ভাবে জমাটি আলাপ করার মত বন্ধু বান্ধব গড়ে ওঠেনি।

আরেকটি কারণও ছিল। তাহল রাজনৈতিক অস্থিরতা বা ডামাডোল। এককথায় এই বাংলায় শ্রেণীসংগ্রাম এতটাই তীব্র পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সাধারণ কথা- বার্তার মধ্যেও প্রত্যেকেই একটা রাজনৈতিক ইঙ্গিত খোঁজার চেষ্টা করে। ফলে মনখুলে কথাবার্তা বলতে গেলেও ভেবে চিন্তে বলতে হয়।

গ্রামের বাড়ীতে আর মন টিকছিল না। অগত্য আবারও হোস্টেলে ফিরে এসেছি। এদিকে দু-চার দিনের মধ্যে দেবাশীষ-সঞ্জয়েরাও হোস্টেলে ফিরে এল। যদিও ওদের দুজনেরই শহরে বাড়ী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোরা ফিরে এলি যে? ওরা বলল যে শহর এলাকাতে যেভাবে রাজনৈতিক হিংসা- হানাহানি হচ্ছে, প্রায় প্রতিদিনই দু-একজন করে খুন হচ্ছে। তার থেকে এই হোস্টেলই ভালো। আর যাই হোক না নিজেদের মধ্যে তো খোশ গল্প করে সময়টা কাটাতে পারবো।

পশ্চিমবঙ্গে এখন রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে; আগামী দুমাস পরে নির্বাচন। নির্বাচনের দিন ঘোষণাও হয়ে গেছে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার তুঙ্গে। বিভিন্ন জায়গায় জনসভা, পথসভা, মিছিল মিটিং লেগেই রয়েছে। আমরাও স্থানীয়ভাবে কিছু কিছু জায়গায় মিটিং, মিছিল, জনসভায় যেতে শুরু করেছি।

যদিও তরুন বাবু আমাদের কে সব জায়গায় যেতে দিতেন না। কিন্তু স্থানীয় নেতাদের একান্ত ঘরোয়া আলোচনা সভাতে যেতে তরুন বাবুর আপত্তি ছিল না। যেখানে কনকের বাবা, রতনের বাবা, মৌসুমীর বাবা ও তরুন বাবুরা উপস্থিত থাকতেন। বলা বাহুল্য রাজনৈতিক পরিভাষায় এগুলিকে শিক্ষা শিবির বলা হয়। মূলত এগুলি দেশের অর্থনীতি সমাজনীতি, শিক্ষা নীতি, সমাজের শ্রেণীগত অবস্থান। আশু কর্তব্য, ভবিষ্যতের পথ নির্দেশিকা—মূলত এ বিষয়েই আলোচনা হত। সব কর্মসূচীতে যোগদান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না বা আমরা ঘোরাফেরা করতাম তাতেই বিরোধীপক্ষের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের হোস্টেলের কাছেই পুলিশ স্টেশন বা থানা। থানার বড় বাবুর সাথে মাঝে মধ্যে কখনও দেখা হয়ে যেত। যদিও থানার বড়বাবু সরকারী নির্দেশনা যার গতিবিধি বুঝে আমাদের কে এসব রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া বা অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন, সেটা হয়তো প্রচ্ছন্ন স্নেহ ও আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই করতেন। যা তাঁর কথাবার্তা বলার ভঙ্গীতে ফুটে উঠতো। উনি বলতেন আগে লেখা পড়াটা শেষ করে তারপর যা ভালো বুঝবে। কিন্তু ঐ কিশোর বয়সের উদ্দাম আবেগের গতিকে রুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। কারণ-

যদিও তরুন বাবু আমাদের কে সব জায়গায় যেতে দিতেন না। কিন্তু স্থানীয় নেতাদের একান্ত ঘরোয়া আলোচনা সভাতে যেতে তরুন বাবুর আপত্তি ছিল না। যেখানে কনকের বাবা, রতনের বাবা, মৌসুমীর বাবা ও তরুন বাবুরা উপস্থিত থাকতেন। বলা বাহুল্য রাজনৈতিক পরিভাষায় এগুলিকে শিক্ষা শিবির বলা হয়। মূলত এগুলি দেশের অর্থনীতি সমাজনীতি, শিক্ষা নীতি, সমাজের শ্রেণীগত অবস্থান। আশু কর্তব্য, ভবিষ্যতের পথ নির্দেশিকা—মূলত এ বিষয়েই আলোচনা হত। সব কর্মসূচীতে যোগদান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না বা আমরা ঘোরাফেরা করতাম তাতেই বিরোধীপক্ষের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিলাম।

শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা তথা স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনায় অধীর তখন আমরা। সারা দেশের যুব- ছাত্র, শ্রমিক- কৃষকের কাছে সমাজবদল, দিন বদলের ডাক এসে গেছে, অমোঘ হাতছানি। এখন পড়াশুনার পাট নেই বলে আরও নিবিড়ভাবে মতাদর্শগত ভাবে পুষ্ট হওয়ার তাগিদ জোরালো হয়েছে। একই সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শন ভাববাদী দর্শন, দেশী বিদেশি মনীষী বিপ্লবীর সমাজ সংস্কারক গ্রন্থগুলি গোগ্রাসে গিলে খাচ্ছি। সব কিছু যে হজম হচ্ছে তা কিন্তু নয়। তাই উচ্চ নেতৃত্ব, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং উচ্চ মেধা সম্পন্ন প্রফেসরদের কাছে যাওয়া একটা নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। কারণ কলেজের প্রফেসরদের কোয়ার্টার আমাদের স্কুল হোস্টেল থেকে পায়ে দুমিনিটের পথ। সুতরাং এ পথটুকু পাড়ি দিয়ে কোয়ার্টারে যেতে আমাদের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বেশির ভাগ সময় তরুনবাবুই আমাদের সঙ্গী হতেন।

১২তম অধ্যায়:– একটা মৃত্যু, একটা প্রশ্নের জন্ম।

তরুন বাবুর ফিলিপস কোম্পানীর রেডিওর সংবাদে জানা গেল সামনের সপ্তাহে হায়ার সেকেণ্ডারীর রেজাল্ট আউট হবে। সবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, হাতে রেজাল্ট নিয়ে বাড়ী ফিরবো। কাছে পিটের বন্ধু বলতে রতন, কনক, মৌসুমীদের বাড়ীতে দেখা করে এলাম।

বাড়ীর গুরুজনেরা আমাদের শুভ কামনা করে মিষ্টি মুখ করালেন। মৌসুমী পাশের দোকান থেকে চকোলেট কিনে এনে আমাদের প্রত্যেকের হাতে গুজে দিয়ে গেল। হোস্টেলে ফিরে বিকালের দিকে প্রফেসর কোয়ার্টারে যাব ভাবছি। এমন সময় আমার বাড়ী থেকে কাজের লোক শংকরদা এসে খবর দিল যে, আমার ঠাকুমা খুবই অসুস্থ। তরুন স্যারকে বলে তখনি বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম।

বাসস্টাণ্ডে আসার পথে শংকরদা বললে, এখনও কথা বলছে। দু-এক টুকরো ফলও খাচ্ছে। তোমার হাতে একটা আম খেতে চেয়েছে। বাজারে ফলের দোকানে গিয়ে আমের খোঁজ করতে গিয়ে দেখি আম আছে। দোকানী বললে- এটা তোতাপুরী জাতের আম। অন্য জাতের আম- হিমসাগর, ল্যংড়া; তোতাপুরীর জাত চিনি না। স্বাদের তফাৎও জানি না। আম আমার কাছে আমই। জাতের বিচার করার বুদ্ধিও নেই, ফুরসৎও নেই। যাইহোক ওরই মধ্যে একটা পাকা দেখে তোতাপুরী আম পছন্দ করে কিনে বাড়ী এলাম। প্রথমেই ঠাকুমার সাথে দেখা করলাম। আমাকে দেখেই কাছে বসতে ইশারা করলেন—তুই এসেছিস বলে গায়ে মাথায় হাত বোলালেন। আমিও ছল ছল চোখে জিজ্ঞাসা করলাম কেমন আছো? কী কষ্ট হচ্ছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বললেন—তোকে দেখার জন্য মনটা বড় আনচান করছিল, যাক তোর সঙ্গে দেখাটা কপালে ছিল। আমি বললাম—তুমিতো আমার হাতে আম খেতে চেয়েছিলে? ঠাকুমা বললে- হ্যাঁ এনেছিস? আমি মাকে বললাম—মা দেখ ব্যাগের মধ্যে আম এনেছি, তুমি এখন ওটা কেটে দাও। ঠাকুমাকে খাওয়াবো।

মা তৎক্ষণাৎ আম ধুয়ে কেটে দিলে। একটুকরো আম ঠাকুমাকে খাওয়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম আমটা মিষ্টি? ঠাকুমা ফোকলা মাড়িতে মুখ নাড়তে নাড়তে কি যে বল্‌লে স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবে মুখ ভঙ্গী দেখে বোঝা গেল খুব একটা সুস্বাদু না হলেও একেবারে ফেলে দেওয়ার মত নয়।

ঠাকুমার শরীরের দিন দিন অবনতি হচ্ছিল। খাওয়া- দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, গ্লুকোজের সরবৎ তাও ঠিকমত গিলতে পারছেন না। পেনিসিলিন, স্টেপটো মাইসিনের ইনজেকসনেও থার্মোমিটারের পারদের ঊর্ধ্বগতি থামাতে পারছিল না। অবশেষে তিনদিন পর হৃদস্পন্দন থেমে গেল। যে মানুষটি চারদিন আগে আমার দেখার জন্য আকুল হয়ে চোখ মেলে ছিল, আমার হাতের ফল খাওয়ার বাসনা হয়েছিল। আজ সে মাটির তলায় চৌদ্দ পোয়া জমিনে ঢুকে গেল। ঐ মুহূর্তের শূণ্যতা জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে একটা কৌতূহলী প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। যে প্রশ্নের উত্তর হয়তো সারা জীবন ধরেই খুঁজে বেড়াতে হবে। (ক্রমশ)

মুসা আলি

রাতের সঙ্গী

মনের নিবিড়তায় ছেদ পড়লেই মানুষ তা মেনে নিতে চায় না। ভিতরে ভিতরে ভীষণ কষ্টবোধ করে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ফোনে বাপের বাড়ির খবরটুকু শুনে আফরিন কেমন যেন আনমনা হয়ে যেতে বাধ্য হলো। একমাত্র দাদা গুরুতর অসুস্থ। মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তখনও জ্ঞান ফেরেনি। বোনের কাছে এর থেকে খারাপ খবর আর কী হতে পারে।

সেই সঙ্গে ভিতরে ভিতরে অন্য দোলাচলের অস্থিরতা। ছেলে শাহিন স্কুলে। বিকেলের সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমের আকাশে। তেজ কমছে তর তর করে। শরতের হিমেল বাতাস মিঠে রোদের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব পাতাতে ব্যস্ত। আফরিনের মন তখনও দোটানার ব্যাকুলতায় দুলছে। সামনে পরীক্ষা, অসুস্থতার খবর কিছুতেই ছেলেকে জানানো যায় না। জানালে যে ক্ষতি তা বাস্তবিক অপূরণীয়। ওর বাপি গতকাল শিলিগুড়ি গেছে। ফিরবে এক সপ্তাহ পরে। একটা জটিল তাৎক্ষণিক সমস্যা।

পায়ে পায়ে পাশের বাড়িতে গেল। মুশির মাকে সামনে পেয়ে বলল, একটা অনুরোধ করতে এসেছি।

বলো বৌমা।

শাহিনের মামা গুরুতর অসুস্থ, মুশি যদি রাতটুকু শাহিনের সঙ্গে থাকে।

বেশ তো, বলছ যখন মুশিকে বলে দেব। তুমি কী এক্ষুণি বের হচ্ছ?

যেতে তো হবে, আরেকটা অনুরোধ।

বলো বলো।

বাড়িতে ফিরলে শাহিনের কাছে বিপদের কথা কিছু বলবেন না, অকারণে আকাশ কুসুম ভাবতে পারে।

বেশ তো, বলছ যখন।

তাহলে আসছি।

সাবধানে যেও বৌমা।

আফরিন আর কথা বাড়ালো না। শাড়ি পাল্টে সদর দরজায় লক করে চাবির গোছা মুশির মায়ের হাতে দিয়ে বের হয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট হাঁটলেই বাসস্ট্যান্ড। তখনও আফরিনের মনের ইজেলে দাদাকে নিয়ে বিপদসংকেতের চোকরা-বোকরা ছবি ভেসে রয়েছে। প্রকৃতির ঝড় মনের ঝড়ের কাছে কত সহজে হার মানে, তা বেশ টের পাচ্ছে আফরিন।

বিকেলের খেলা শেষ হলেই বাড়িতে ফিরে এসে শাহিন দেখল, মা বাড়িতে নেই, অবশ্য তা নিয়ে খুব বেশি সময় ভাবতে হলো না। মুশির মা এসে বলল, জরুরী দরকারে মামার বাড়িতে গেছে তোর মা। রাতে মুশি তোর সঙ্গে থাকবে। ভাত-তরকারি রান্নাঘরে হাঁড়িতে আছে, খেয়ে নিস।

সন্ধে উতরে গিয়েছে বলেই ছোপ ছোপ আঁধারের প্রলেপ শুরু হয়েছে মাটির বুকে। কলপাড়ে মুখহাত ধুয়ে বারান্দার উপর এসে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে দেখল, ঘনিষ্ঠ বন্ধু অনুব্রত এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে। দু'জনে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু কলেজ-জীবন শুরু হতেই দু'জনের পড়াশোনার ক্ষেত্র পাল্টে গেছে। যোগফলও বিপরীতমুখি। অনু ভর্তি হয়েছে বারাসাত ধ্রুবচাঁদ কলেজে। শাহিনের নতুন শুরু বিরেশ্বরপুর কলেজে। বিপরীতমুখি চারণক্ষেত্র হওয়ায় দু'জনের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ছিল না আর। ফলত সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলা অনুকে সামনে পেয়ে শাহিন আন্তরিকতা দেখিয়ে বলল, কেমন আছিস রে?

ভালো আছি, রোজ বিকেলে তোকে খুব মনে পড়ে, ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠি।

শাহিনের মধ্যেও অনুরূপ অনুশোচনার ঢেউ। অনুকে ঘরের ভিতরে বিছানার উপর বসতে দিয়ে পাশের বাড়িতে গিয়ে বলল, মুশিকে আর আসতে হবে না, অনুব্রত এসেছে, রাতে আমার কাছে থাকবে। কোনো অসুবিধা নেই।

ঠিক বলছিস্ তো বাবা? মুশির মায়ের আন্তরিক প্রশ্ন।

শাহিনের মুখে হাসি, সুন্দর সদুত্তর।

তাহলে দু'জনে রাতটুকু একসঙ্গে থাক।

শাহিন আবার হেসে দিল।

সকালে তোর মা ঠিক চলে আসবে।

গান যা হিট করেছে।

দে তাহলে।

শাহিন নিজস্ব মনোযোগ নিয়ে রিমোট্ ঘুরিয়ে জি-বাংলায় নিয়ে গিয়ে পাশে চেয়ে দেখল, অনু বিছানার উপর নেই। প্রশ্ন জাগল শাহিনের মধ্যে, পাশেই বসে ছিল, এক পলকে গেল কোথায়? ডাকতে শুরু করল, এ্যাই অনু, গেলি কোথায় রে?

এই তো আমি।

শাহিন অনুর গলা স্পষ্ট শুনতে পেল কিন্তু দেখতে পেল না। বাধ্য হয়ে দ্রুত পায়ে বারান্দায় এসে বলল, কোথায় রে তুই?

শাহিন হতবাক, কেমন যেন বিমূঢ়, ধস্ত মানসিকতায় জারিত হতে হচ্ছে তাকে। কোন পথে গেল অনু? বারান্দা ধরে গেলে তো সে দেখতে পেত। হনহন পায়ে ঘরের ভিতরে ফিরে এসে দেখল, অনু বিছানার উপর বসে এক মনে টিভি দেখছে। কোন পথে ঘরে ঢুকলি তুই?

রাত বাড়ছে পলে পলে। অনুর সঙ্গে শাহিনের গল্পের মাত্রা বেড়ে চলেছে তির তির করে। অকৃত্রিম বন্ধু অনুর বিচিত্র কথায় শাহিন পুলকিত হচ্ছে বার বার। বিছানার উপরে দু'জনে মুখোমুখি বসে। অনুর মধ্যে আবেগের আতিশয্য। শাহিনকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুইয়ে ফেলল। হুল্লোড়ের মজা পেতে চাচ্ছে।

বাধা দিতে দিতে শাহিনের চাপা প্রশ্ন, এসব কী করছিস রে?

কতদিন পরে দেখা, একটু জড়িয়ে মড়িয়ে নিচ্ছি।

এখনও সারা রাত পড়ে রয়েছে।

বন্ধুত্বে রাতদিন হয়? তোর গলাটা কী তুলতুলে রে। দু'হাতের দশ আঙুল দিয়ে শাহিনের গলায় চাপ দিতে শুরু করল অনু। মুখে খিল্ খিল্ হাসির ফোয়ারা। অনুর অনুপ্রাস উক্তি, তোকে কী ভালো লাগছে রে।

শাহিন বাধ্য হলো অনুর হাসিতে যোগ দিতে। ফর্সা মুখে অনুপম হাসি। সেই মাত্রা বেড়েই চলেছে।

শাহিনের চকিত প্রশ্ন, এ্যাই অনু, একটু টি.ভি. দেখবি? জি-বাংলায় ভালো সিনেমা চলছে। দেবের 'পাগলু', দুটো

এই তো এখানে।

কোথায় বলবি তো?

রান্নাঘরে।

ওখানে গেলি কেন?

খুব তেষ্টা পেয়েছিল।

আমাকে বলতে পারতিস।

তুই তো টিভি দেখায় মত্ত।

আমাকেও এট্টু জল খেতে হবে রে।

তাহলে জলের পাত্রটা নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে দেখে তোর জল খাবার কথা মনে পড়ল?

তা হতে পারে।

রান্নাঘরে অনুর খিলখিলে হাসি।

তটস্থ শাহিন পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেখল, অনু রান্নাঘরে নেই। ভিতরে অচেনা কৌতূহলের চিত্রবিচিত্র ছবি। দু'চোখ তন্ন তন্ন করে রান্নাঘরের সর্বত্র আবার দেখে নিল। রহস্যের জড়তা সারা শরীর জুড়ে। শব্দ আছে, শারীরিক প্রকাশ নেই। এও কী সম্ভব? ভয়বিহ্বল শাহিনের প্রশ্ন, কই রে, কোথায় তুই?

জল খাওয়া শেষ করে ঘরের ভিতরে চলে এসেছি।

শাহিন হতবাক, কেমন যেন বিমূঢ়, ধস্ত মানসিকতায় জারিত হতে হচ্ছে তাকে। কোন পথে গেল অনু? বারান্দা ধরে গেলে তো সে দেখতে পেত। হনহন পায়ে ঘরের ভিতরে ফিরে এসে দেখল, অনু বিছানার উপর বসে এক মনে টিভি দেখছে। কোন পথে ঘরে ঢুকলি তুই?

কেন বারান্দা দিয়ে।

তাহলে তো দেখতে পেতুম।

মায়ের ভাবনা বেশি মাথায় নিলে চোখের দেখা এমনি হয়।

মা কোথায় গিয়েছে বলতে পারবি?

মাসিমা এখন বাপের বাড়িতে।

জানলি কী করে?

অনু হো হো শব্দে হাসছে, শাহিনের মধ্যে তটস্থ ইচ্ছার দ্রুত জাগরণ ঘটছে। আসার পর থেকে সে তো মায়ের কথা একবারও বলেনি অনুকে। শাহিনের ঝাঁকুনি প্রশ্ন, এ তথ্য জানলি কী করে?

জেনেই এসেছি, তারপর হাসির হুল্লোড়ে মেতে উঠল অনু। শাহিন প্রিয় বন্ধুর হাসিতে যোগ না দিয়ে পারল না। অনু আবার শাহিনকে জড়িয়ে মড়িয়ে নরম বিছানায় শুইয়ে ফেলল। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে। তাতে বিটকেল গন্ধ। অনুর দিকে শাহিনের অপলক দু'চোখ। কোনো যুক্তির নিরিখ মিলছে না। শাহিনের তুলতুলে গলায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অনুর স্বগত উক্তি, আহারে, কী নরম! রোজ ক্রিম মাখিস, না? আঙুল দিয়ে টিপছি। কী আরাম লাগছে।

অনুর আচরণে শাহিনের মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থান। আগে কখনো এমনি আচরণ করেনি। মুখ ঘুরিয়ে অনু বলল, হ্যাঁরে, জল খাবি বলে জগ আনলুম, এক ঢোকও তো খেলি নে।

জলের পাত্রটা তোর বাম পাশে রয়েছে, সরিয়ে দে।

এই নে।

শাহিন পাত্রটা উঁচু করে ধরে ঢক ঢক শব্দে জল খেতে শুরু করল। অনুর প্রশ্ন, মিষ্টি জল বলে বেশি খাচ্ছিস?

কলসির জল মিষ্টি হলো কী করে বলতো?

মাসিমা হয়তো চিনি ফেলে দিয়ে গেছে।

শাহিনের মধ্যে অভিনব ভাবনার ধাক্কা, মা তো কোনোদিন জলের কলসিতে চিনি ফেলে দেয়নি? কেনই বা দিতে যাবে? রান্নাঘরে গিয়ে কলসির জল আরেকটু খেয়ে দেখব? শাহিন উঠে দাঁড়ালো।

আবার জল খাবি নাকি?

আমার ইচ্ছা জানলি কী করে।

এমনি বললুম।

একই কলসির জল দু'রকম হয় নাকি? রাগ দেখাতে হুড়মুড়িয়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, অনু সেখানে নেই। তবুও ভাবল, কলসির জল খেয়ে অনুকে মিথ্যা প্রমাণিত করতেই হবে। গ্লাসে ঢেলে জিভে দিয়েই বুঝল, সত্যি খুব মিষ্টি। লেবুর সেন্ট মেশানো। এভাবে পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে কী করে? সাধারণ পানীয় থেকে মিষ্টি পানীয়, তা থেকে লবণাক্ত, আবার মিষ্টি পানীয়? হতবাক শাহিনের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত কম্পন।

শাহিন চেয়ে থাকল অনুর দিকে।

এখন কলসির জল লোনা হয়ে গেছে রে।

একই পাত্রে দু'রকম জল থাকতে পারে?

কখনো কখনো তাই হয়।

শাহিন রাগ দেখিয়ে বলল, যা খুশি তাই বলছিস?

রান্নাঘরে গিয়ে জল খেলে বুঝতে পারবি।

শাহিন ডিগ্রি কোর্স পড়ে। কোনো লজিক মিলছে না। সাগ্রহে রান্নাঘরে গিয়ে এক ঢোক জল খেতেই সারা শরীর বিড় বিড় করে উঠল। কৌতূহলের বন্যা তার ভিতরের নদীতে। দ্রুত পায়ে বারান্দা পার হয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখল, অনু সেখানে নেই। আবার গেল কোথায়? কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছে। ডাকতে শুরু করল শাহিন, কই রে তুই?

এই তো রান্নাঘরে।

আবার ওখানে কেন?

ভাবলুম, আমিও একটু খেয়ে দেখি।

কলসিতে তো লবণ জল।

কী বাজে বকছিস? এই তো খাচ্ছি, সরবতের মতো মিষ্টি।

শাহিনের কৌতূহল উঁচু পাহাড়ের সমতুল্য। স্রেফ বাজে বকছে অনু। একই কলসির জল দু'রকম হয় নাকি? রাগ দেখাতে হুড়মুড়িয়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, অনু সেখানে নেই। তবুও ভাবল, কলসির জল খেয়ে অনুকে মিথ্যা প্রমাণিত করতেই হবে। গ্লাসে ঢেলে জিভে দিয়েই বুঝল, সত্যি খুব মিষ্টি। লেবুর সেন্ট মেশানো। এভাবে পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে কী করে? সাধারণ পানীয় থেকে মিষ্টি পানীয়, তা থেকে লবণাক্ত, আবার মিষ্টি পানীয়? হতবাক শাহিনের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত কম্পন। প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে ডাকল, এই অনু, অনু রে।

এই তো আমি।

কোথায় বলবি তো?

ঘরের ভিতরে এসে টি.ভি. দেখছি।

গেলি কোন পথে?

আমার সঙ্গে খচরামি করিস নে, দেখলুম তো, তুই বারান্দা ধরে রান্নাঘরে গেলি।

সত্যি বলছিস?

যা দেখেছি, তাই বললুম।

শাহিনের অবচেতন মনে ভৌতিক চেতনার সূত্রপাত। যত সব তাজ্জব ঘটনা! অনু তাকে দেখতে পেল অথচ সে। এমনি করেই কী সম্ভব? ভুল করে রিমোটটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়েছিল। তাহলে অনু টিভি দেখছে কী করে?

দেওয়াল ঘড়িতে সাড়ে দশটা। শাহিন দ্রুত পায়ে ঘরের ভিতরে এসে দেখল, নিমগ্ন অনু সিরিয়াল দেখায় মত্ত। শাহিনের প্রশ্ন, হ্যাঁরে টিভি খুললি কী করে? রিমোট তো আমার হাতে।

টিভি খুলতে রিমোট লাগে নাকি?

কী বাজে বকছিস?

বন্ধ করে দেখিয়ে দেব?

পারবি?

অনুর মুখে কয়েকটা শব্দের বিড় বিড় উচ্চারণ। টিভি বন্ধ হয়ে গেল। শাহিনের বিহ্বল দুচোখ অনুর দিকে। এ কোন অনু? এতটাই বিবর্তন ঘটে গেছে?

অনু হো হো শব্দে অট্টহাস্য করে উঠল।

অমন হাসছিস যে?

আমি ম্যাজিক পাওয়ারে টিভি খুলি, বন্ধ করি।

এসব শিখলি কী করে?

ফিলিপ শিকারীর আত্মার যোগফল লাভ করতে পেরেছি! এখন যা খুশি তাই করতে পারি।

কী রকম?

টিভি খুলতে চাইলে বলি, নাতাং নাতাং পুতুং পুতুং। বন্ধ করতে চাইলে উল্টো করে বলি, পুতুং পুতুং নাতাং নাতাং।

অর্থ বুঝলুম না।

অনুপ্রাস ছন্দের হেবরু শব্দ। খোলার জন্য বাংলা শব্দার্থ, পুটুস করে খুলে যা। বন্ধ করতে চাইলে ফিলিপের আত্মা ছুঁয়ে যে মন্ত্র বলি, তার অর্থ, খুটুস করে বন্ধ হ্।

দারুণ মন্ত্র। অভিনবত্বে ভরপুর।

শিখবি তুই?

আমার পক্ষে কী সম্ভব?

খুব মজা পাবি রে?

দিনের বেলায় এ ম্যাজিক পাওয়ার কাজ করে?

প্রয়োগ করতে যাবি কেন? এ তো মায়া-ক্ষমতা, কেবল রাতে প্রয়োগ সম্ভব।

তাহলে তো দারুণ।

চাপা কণ্ঠস্বরে অনুর ছোট্ট প্রশ্ন, রাত তো অনেক হলো, খাবি নে?

তাহলে রান্নাঘরে চল।

অনু মাথা নেড়ে সম্মতি দিল।

শাহিন রান্নাঘরে ঢুকে দেখল, হাঁড়িতে ভাত-তরকারি কিছুই নেই। কুকুর ঢোকেনি তো?

এত কী ভাবছিস? অনুর তাৎক্ষণিক প্রশ্ন।

হাঁড়ি শূন্য।

খেতে বস, ম্যাজিক ক্ষমতায় উড়িয়ে আনছি।

তা কী সম্ভব?

শাহিন খেতে বসল। অনু হাঁড়ির ভিতরে হাতা ঢুকিয়ে শাহিনের থালায় ভাত ভরে দিল। বলল, তরকারি দেব তো?

নাহলে খাব কী করে?

অনু শাহিনের খাবার পাত্রে পর পর নানা পদ সাজিয়ে দিতে থাকল। আলু ভাজা, ডিম ভাজা, একটু ডাল, ইলিশ মাছের ঝোল, দেশি মুরগির কারি, কিছুটা চাটনি।

শাহিনের মধ্যে বহুমুখি প্রশ্নের ডালি। মা তার জন্যে শুধুমাত্র ডিমের তরকারি রান্না করে রেখে গেছে। অনু এতগুলো পদ খেতে দিতে পারল কী করে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, তাহলে মায়ের রান্না ভাত-তরকারি খেয়ে ফেলল কে? কুকুর ঢোকার সম্ভাবনা নিজেই খারিজ করে দিল। সামনের গ্রিলে লক করা, ঢুকবে কী করে?

শাহিনের বুকের গভীরে অদ্ভুত কম্পনের রিদম। দুচোখ অনুর দিকে। স্থিরদৃষ্টি। তাতেই ঝাপসা ভাবনার ছবি, শাহিনের মধ্যে অন্তহীন দোদুল্যমানতা। অনুর বেশে অন্য কেউ নয় তো? কিন্তু কঠোর বাস্তবে তা কী সম্ভব?

ছোট্টা হাই তুলে অনুর প্রশ্ন, কেমন খাচ্ছিস বল্? ম্যাজিক পাওয়ার শিখলে এমনি করে যখন তখন যা খুশি খেতে পারবি।

শাহিনের বুকের গভীরে ঢিপঢিপ শব্দদোল। দ্রুত খাওয়া সেরে অনুকে বলল, তুই খেলি নে?

হো হো শব্দে অট্টহাস্য করে উঠল অনু। হেঁসেলের কানায় কানায় সেই শব্দবিম্বের বিস্তার ঘটে গেল। মাসিমা তো তোর জন্যে ভাত আর ডিমের ঝোল রেখে গিয়েছিল।

জানলি কী করে?

শাহিনের বুকের গভীরে অদ্ভুত কম্পনের রিদম। দুচোখ অনুর দিকে। স্থিরদৃষ্টি। তাতেই ঝাপসা ভাবনার ছবি, শাহিনের মধ্যে অন্তহীন দোদুল্যমানতা। অনুর বেশে অন্য কেউ নয় তো? কিন্তু কঠোর বাস্তবে তা কী সম্ভব?

খেতে খেতে জানলুম।

কখন খেলি এসব?

আবার অনুর অট্টহাসি। ম্যাজিক পাওয়ারের খাওয়া রে। যে কোনো সময় সেরে ফেলতে পারি। সেজন্যে রান্নাঘরে যেতে হবে কেন? চল দুজনে শুয়ে পড়ি, বেশ রাত হয়েছে।

কোনো হিসেব মিলছে না শাহিনের। তালগোল পাকানো একটা অসম্ভব অবস্থান। নিজের হাতে বারান্দার লাইট নিভিয়ে দিল। ঘরের ভিতরে ঢুকে বলল, নাইট বাল্বের সুইচটা অন করে দিই?

না, সজোরে চেঁচিয়ে উঠল অনু।

অমন চীৎকার করলি যে?

আলো থাকলে ঘুমুতে পারি না।

বেশ তো তাই হোক।

অনু সজোরে শাহিনকে জড়িয়ে ধরে বিছানার উপর আবার শুইয়ে দিল।

এসব কী করছিস?

তুই কী ভালো রে।

ছাড় আমাকে।

অনু কিন্তু ছাড়ল না। দু'হাতের দশ আঙুল দিয়ে শাহিনের গলায় চাপ দিতে শুরু করল। শাহিনের মধ্যে মত্যুভয়ের রেশ। একটা অচেনা টানাপোড়েনের জলছবি, অনু কিন্তু আর বেশি কিছু করল না।

বাহির থেকে তারস্বরে রাত-প্যাচার ডাক ভেসে আসছে। ঝিঁঝির হিল্লোল, ঝিল্লির শব্দের অপূর্ব ছন্দবিলোল। রাতের প্রহর এগিয়ে চলেছে। দুটোর দিকে ঘুম ভেঙে গেল শাহিনের। পাশে চোখ রেখে দেখল, অনুর দুচোখে আগুন জ্বলছে। সমস্ত ঘর আলোকিত। সেই জ্যোতি নাইটবাল্বের চেয়ে অনেক

বেশি উজ্জ্বল। ভয়ে কুঁকড়ে থাকল শাহিন। পাশের বেডশিটটা টেনে সারা শরীরে মুড়ে দিল। খুব করে মনে পড়ছে মায়ের কথা। তার জীবনের শেষ সময়টুকু মা কী দেখতে পাবে না? নিজের মৃত্যুভয় আর মায়ের মমত্বময় মুখ পাশাপাশি দোল খাচ্ছে।

শাহিনের মাও হাসপাতালের চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে ভিন্ন চিন্তায় ভীষণ উদ্বেল। ডাক্তারবাবু স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, আর কোনো ভয়ের কারণ নেই, ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবেন, কিন্তু রাতে ছেলে শাহিন কেমন করে সময় পার করছে, সেটাই তাৎক্ষণিক মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠল। কৌতূহলের সমুদ্র নিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক ও তার কাজকর্ম। এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থাকতে পারে না। উপযুক্ত ক্ষেত্র না থাকলে নতুন কোনো ভাবনা খুঁজে নিয়ে চরম দুর্ভাবনায় রূপান্তরিত করে তোলে। তাহলে কী মস্তিষ্কের শক্তিকে কেবল না সূচক হিসাবে গণ্য করব? গ্যালিলিও জীবনের শেষ ন'টা বছর কারাগারে বসে অসহনীয় জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছেন ধর্মবাদীদের চাতুরী চিন্তার কারণে। চিন্তার ক্ষেত্রে এমনি প্রকারভেদ রয়েছে। যা সদর্থক চিরন্তন, সেটাই কেবল গ্রহণীয়। শাহিনের মা তো তুচ্ছ একজন মেয়ে। নিজের ছেলের জন্যে দুর্ভাবনা থাকাটা তো তার জীবনে অত্যন্ত স্বাভাবিক গুণ।

ভোর হতেই শাহিনের মা যন্ত্রচালিত ভ্যানে বাড়িতে ফেরার উদ্যোগ নিল। সকাল হতে তখনও আধঘন্টা সময় বাকী। চারদিকে ছোপ ছোপ অন্ধকার। একটানা ঝিল্লির শব্দ ভেসে আসছে কানে। যন্ত্রচালিত ভ্যান এসে থমকে দাঁড়ালো মূল রাস্তার ডানপাশের বাড়ির সামনে। নেমেই শুনল, ভিতরে ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে। অবাক না হয়ে পারল না। বলল, এ্যাই শাহিন, কী হয়েছে রে?

দ্যাখো না মা, অনু আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চাচ্ছে।

ও এসেছে কখন?

সন্ধের সময়।

তোর ক্লাসমেট অনু তো? চাপলায় বাড়ি?

হ্যাঁগো মা।

তাড়াতাড়ি সামনের গেটের চাবিটা খুলে দে।

পারলে তবে তো

কেন কী হয়েছে?

অনু কিছুতেই ছাড়ছে না। বুকের উপর চেপে বসে রয়েছে।

কী বলছিস তুই?

হ্যাঁগো মা।

একটু দাঁড়া, পাশের বাড়ির কাউকে ডেকে আনছি।

অনু ত্রস্ত হতে বাধ্য হলো। সেটাই শাহিনের কাছে অনন্য সুযোগ হয়ে দেখা দিল। প্রচণ্ড ঝটকায় অনুকে ঘরের মেঝেতে ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে সামনের গেটের লক খুলে দিল।

ভিতরে ঢুকেই শাহিনের মায়ের তির্যক গর্জন, অনু কই?

ওই তো ঘরের মেঝেতে?

শাহিনের মা দ্রুত ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখল, সেখানে কেউ নেই।

শাহিন ডাকল, এ্যাই অনু, অনু রে।

রান্নাঘর থেকে অনুর গলা ভেসে এল, এই তো আমি এখানে।

শাহিনের মা আধদৌড়ে হেঁসেলে ঢুকে দেখল, সেখানেও অনু নেই। গেল কোথায় ছেলেটা? শাহিনকে উদ্দেশ্য করে হাঁকল, গেটের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়া, তারপর দেখছি।

টিউব ফেটে গেলে যেমন একসঙ্গে অনেক হাওয়া বের হয়ে আসে, ঠিক তেমনি করে দমকা হাওয়ার দোল গ্রিলের দরজার ফাঁক গলে বের হতে থাকল। বাড়ির সামনে বড়ো দেবদারু গাছে ঝড়ের তান্ডব। এই বুঝি গাছটা ভেঙে মাটিতে শুয়ে পড়বে।

ভয়বিহ্বল কণ্ঠস্বরে শাহিনের প্রশ্ন, দেখছ মা, কী ভীষণ জোরে হাওয়া বইছে।

ওরে, চলে যাচ্ছে রে।

কে মা?

তোর বন্ধু অনু দিন পনেরো আগে বাইক এ্যাকসিডেন্ট মারা গেছে। পরশু ওর শ্রাদ্ধও হয়ে গেছে। নেমতন্ন করেছিল। সামনে পরীক্ষা বলে কিছু বলিনি। ওই তো টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে সেই নেমতন্নপত্রটা।

শাহিন ভয়ানক স্তম্ভিত। শরীর মনে কম্পিত। ত্রস্ত ও আতঙ্কিত। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে ডাকল, মা, মাগো। তাহলে এত সময় ধরে কে আমার সঙ্গে ছিল?

কামাল হোসেন

নিজস্ব পুরণে

তোমার নাম?

রেশমা।

ও তো ব্যবসার নাম। বাপের বাড়ির নাম শুনতে চাইছি।

সে নামে তোমার কী দরকার বাপু? তুমি হলে গিয়ে আমার কাস্টোমার। ফেল কড়ি মাখো তেল।

অত নিষ্ঠুর ভাবে বলো না রেশমা। আমি প্রত্যেক সপ্তায় আসি তোমার কাছে দু-জন মানুষের মধ্যে একটা সম্পর্ক তো গড়ে ওঠে। একটা মায়া। হয়তো একেই বলে মহব্বৎ। ভালোবাসা।

হিসহিসিয়ে রেগে ফেটে পড়ে রেশমা। ভালোবাসার কাঁথায় আগুন। তোমার মতো কতো নাগর প্রেম-পিরীতের কথা আওড়েছে। মেয়েমানুষের কাছে এলে বুকের মধ্যে রাজ্যের সিনেমার ডায়গল বুড়বুড়ি কেটে ওঠে। ঝাঁটা মার অমন সোহাগের মুখে।

আহা, রেগে যাচ্ছ কেন রেশমা। আমি ধরো অন্তত গত ছ'মাস আসছি তোমার কাছে সপ্তায় দু-দিন বাঁধা। তোমার ঘরে অন্য খদ্দের থাকলে চুপচাপ ফিরে গেছি, কিন্তু অন্য মেয়েছেলের কাছে যাইনি। তোমাদের গীতা মাসী পর্যন্ত জানে। সে নিজেই সপ্তায় তিন দিন –সোম, বুধ, শুক্র তোমার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই তিন দিন তুমি আমার। এটা প্রেম-পীরিত বলবে না?

না– বলব না। তুমি আস ফূর্তি করতে। কাজ মিটে গেলে পাখি ফুরুৎ। সোজা ঘরে ফিরে বউয়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়। বলে না, ইল্লত যায় না ধুলে। বাবুর আবার সিনেমার হিরো-হিরোইনদের মতো পেয়ার -মহব্বৎ করতে ইচ্ছে হচ্ছে!

তুমি আমার বাড়ি যাবে রেশমা?

এ তো আচ্ছা ঢ্যামনা পুরুষ মানুষ। আমি কেন তোর বাড়ি যাব? এখানে আসিস, পয়সা ফেলিস, যেমন ইচ্ছে ফূর্তি করিস। খবরদার উল্টো পাল্টা বকবি না।

আমি নিয়মিত তোমার কাছে আসি। তোমার ব্যবহার দেখে আমি মুগ্ধ। মনে হয় খুব ভালো ঘরের মেয়ে তুমি। অবস্থার বিপাকে এখানে এসে পৌঁছেছ।

কাপড়-চোপড় এখনো এলোমেলো রয়েছে। লোকটা সপ্তায় তিন দিন নিয়মিত আসে।

খুব একটা রাগী অত্যাচারী চাউপের পুরুষ না। একটা নরম ভালোমানুষ গোছের মানুষ। ভালোবাসার কথা শুনলে মন্দ লাগে না। তবে গীতামাসীর শিক্ষা ভুলে গেলে চলবে না, 'ব্যাটা ছেলেকে কখনো লাই দিবি না। গতর ভাঙিয়ে কারবার। আলাদা আলাদা পুরুষ। একজন কাউকে মন দিয়ে বসলে হবে? ধান্দার কারবারে কেউ পীরিত করার লোক না। সবাই কাস্টোমার। পয়সার সঙ্গে সম্পর্ক।'

কী ভাবছ রেশমা? নরম গলায় মোতি শুধায়। মধ্যবয়সী। শক্ত সমর্থ চেহারা। আর পাঁচটা খদ্দেরের থেকে কোথায় যেন আলাদা। কখনো খারাপ গালিগালাজ দেয় না। বিলেতি মদ খায়। নিজেই নিয়ে আসে। কিন্তু মাপা দু-পেগ। তার বেশি খেয়ে মাতলামি কোনোদিন করেনি। গীতা মাসীর মতে, এরকম ভদ্র খদ্দের পাওয়া ভাগ্যের কথা।

তুমি চাকরি করো না বিজনেস? তোমার সম্পর্কে তো কিছুই জানি না। রেশমা বলে।

তুমি জিগ্যেস করেছ কখনো?

এই তো শুধালাম। মোতির কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়। অন্যমনস্ক ভাবে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে।

তোমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে রেশমা?

তুমি এমন ধারা মানুষ কেন বলো তো?

অবাক চোখে চেয়ে থাকে মোতি। এই চোখের চাউনির সরলতা রেশমার মতো পোড় খাওয়া রমণীর বুকের গভীরে ধাক্কা মারে। কোথায় যেন নদীর জল ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে। নিজেকে খুব অসহায় লাগে। ছেলেবেলার কথা মাঝে মাঝে শুনতে চায় এই পুরুষ। সব কথা কি মনে রাখতে আছে? বিশেষ করে তার মতো শেকড় হারানো দুঃখিনী কন্যার। অথচ সকলের জীবনেই তো শৈশব থাকে। বাবা মা ভাই বোন আরও সব আত্মীয় স্বজন। সকলেই কীভাবে বুঝি হারিয়ে যায় নদীর ভাঙনে জলে মিশে যাওয়া ভূখণ্ডের মতো। কত দ্রুত ঘটে যায় সব কিছু।

আমার কথায় রাগ করলে রেশমা?

মাথা ঘুরিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে রেশমা কী যেন ভাবলো। কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করল না।

অল্প একটু হুইস্কি দাও। মোতি বলল।

খুব নিশ্চিন্তে সেই নগ্ন নারী দুটি গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে শুধালো, জল না স্প্রাইট?

স্প্রাইট, অল্প পরিমাণে।

দুজনে শিথিল শরীরে আধশোয়া অবস্থায় নিশ্চিন্তে ধীরে ধীরে মদ্য পান করতে থাকে। কেউ কোনো কথা খুঁজে পায় না।

আমি একটা কথা ভাবছি, জানো।

মুখ তুলে তাকায় রেশমা। সামনের আলমারির দরজায় লাগানো আয়নায় তার খোলামেলা স্তনদুটি ঝলমলিয়ে ওঠে আর শরীর! এই শরীর ভাঙিয়ে তার ব্যবসা।

ভাবছি, সপ্তায় তিন দিনের বদলে সাত দিনের সব খরচা আমি দেব। গীতামাসীর আপত্তি কিছু নেই তার কমিশন ঠিক থাকলেই হলো। ও আমি ম্যানেজ করে নেব।

মানে?

এবার থেকে অন্য কোনো খদ্দের তোমার ঘরে ঢুকতে পারবে না।

আচ্ছা, আমাকে কি ঘরের মাগী পেয়েছ নাকি? মনে মনে তোমার এত হিংসে, অন্য পুরুষ মানুষকে আমার কাছে ঘেষতে দেবে না।

এইবার মাথায় ঢুকেছে রেশমা রানীর। সারাদিন বিজনেস করব। সন্ধ্যাবেলায় তোমার কাছে চলে আসব। সারা রাত থাকব।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে রেশমা বিড়বিড় করে কী যেন বলে। তারপর একটু কর্কশ গলায় বলল, পয়সাগুলো একটা বেশ্যামাগীর পেছনে না উড়িয়ে কোনো ভদ্র ঘরের মেয়েকে বিয়ে করে ফেল। সে তোমার সব প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে।

ওই যে বললাম, মোহব্বৎ। ভালোবাসা। তোমার প্রেমে পড়ে গেছি রেশমা। খুব ধীরে ধীরে নরম গলায় মোতি বলে।

চুমুক দিয়ে একটু মদ খায় রেশমা। এই তার ছোটোঘর।। আলনায় শাড়ি কাপড়। শস্তার আলমারি। তার দুরজায় লম্বা আয়না। একটা ছোট ড্রেসিং ডেবিল। খদ্দের আসার আগে নিয়মিত সাজগোজ করতে হয়। এক কোণায় ঠাকুরের সিংহাসন। ছেলেবেলায় ঠাকুমা কৃষ্ণ ঠাকুরের পুজো করা শিখিয়েছিলেন।

আঃ ছেলেবেলা! এই লোকটা তার কাছে ছেলেবেলার গল্প শুনতে চায় মাঝে মাঝে।

ব্যাপারটা ভালো হবে না? অন্য কোনো পুরুষ তোমাকে ছোঁবে না।

কিন্তু এতদিন তো ছুঁয়েছে। সেসব স্মৃতি কি গঙ্গার জলে

আমি অনেক ভেবেছি। চিন্তা করেছি। সব সময় তোমার কথা মনে পড়ে। আর পবিত্রতার কথা বলছ? মানুষের শরীর গঙ্গার মতো সব সময় পবিত্র। কে কখন ডুব দিল, কোনো স্মৃতি স্থায়ী হয় না। আসলে তো মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। কে কার প্রেমে পড়বে অঙ্ক কষে বলা যায়? তুমি নিজেও কি অস্বীকার করবে, আমাকে তুমি ভালোবেসে ফেলনি? নিজের কাছে লুকোচুরি খেল না।

ধুয়ে মুছে যাবে? আমি তো একটা নরকের কীট। হাজার চেষ্টা করলেও আমি সতী-সাধ্বী পবিত্র মেয়েমানুষ হতে পারব না। কোনোদিন না। আমাকে প্রেম-ভালোবাসার স্বপ্ন দেখিও না গো। কাঁদতে থাকে রেশমা।

এটা স্বপ্ন না। বাস্তবিক আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি রেশমা। আমার খালি মনে হয়, তুমি আর সকলের থেকে আলাদা।

প্রেমে পড়লে সব পুরুষ মানুষেরই একই দশা হয়। এরকম দুচারটে প্রেমিক নিয়মিত আমাদের গলিতে যাওয়া আসা করে। কেউ কেউ তাদের প্রেমিকা অন্য ঘরের সঙ্গে ব্যস্ত থাকলে দরজার বাইরে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আমরা ওদের আদর করে জামাই বলে ডাকি। বেশির ভাগ ন্যালাখ্যাপা, পকেটে ফুটো কড়ি নেই, ওদিকে প্রেমিক হওয়ার ষোলো আনা সাধ। আমার কথা হচ্ছে, আমার মতো বেবুশ্যে মেয়ে মানুষ ছাড়া প্রেম করার কাউকে খুঁজে পাওনি? তোমার ঘরের বউটার কথাও ভাবো।

আমি অনেক ভেবেছি। চিন্তা করেছি। সব সময় তোমার কথা মনে পড়ে। আর পবিত্রতার কথা বলছ? মানুষের শরীর গঙ্গার মতো সব সময় পবিত্র। কে কখন ডুব দিল, কোনো স্মৃতি স্থায়ী হয় না। আসলে তো মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। কে কার প্রেমে পড়বে অঙ্ক কষে বলা যায়? তুমি নিজেও কি অস্বীকার করবে, আমাকে তুমি ভালোবেসে ফেলনি? নিজের কাছে লুকোচুরি খেল না। একটা কোনো অঘটন ঘটে গেছে তোমার অল্প বয়সে। ভালো ঘরের মেয়ে তুমি। কথাবার্তা, আদব-কায়দা দেখলেই বোঝা যায়। আমার প্রেম কিন্তু মিছে কথা নয়।

কাঁদতে কাঁদতে রেশমা বলল, আজ কিন্তু আমি বেশি নেশা করব। আমাকে মানা করবে না।

দুই

দেখতে দেখতে আরও ছ'মাস কেটে গেছে। মোতি এখন রোজ সন্ধ্যায় আসে। রেশমা রান্না করে রাখে। গীতামাসী পছন্দ করে মোতিকে। এরকম ভদ্রলোক এ লাইনে সচরাচর দেখা যায় না। টাকা পয়সা ঠিকঠাক মিটিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত পয়সার হিসাবটাই মোদ্দা কথা।

মাঝে মাঝে দু'জনে এক সঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়। বাইরে ঘুরে ফিরে আসে। হোটেলে ভালোমন্দ খেয়ে আসে। গীতামাসীর মন্দ লাগে না। হয়তো নিজের পুরোনো দিনের কথা মনে আসে। এ রকম দু এক পিস নাগর সকলের জীবনেই ঘুরে ফিরে আসে। তারপর যৌবন, প্রেম, যৌনতা কোথায় যে কোন দূরের দেশে নিরুদ্দেশে হারিয়ে যায়।

টিকিট কেটে ভিক্টোরিয়ার সাজানো বাগানে ঢোকে দুজনে। এরকম মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও ঘুরে বেড়ায় তারা। গীতামাসী তাদেরকে নিয়ে আজকাল মাথা ঘামায় না। নিয়মিত তার টাকা পেলেই সে সন্তুষ্ট। গলির দালালরাও মোতিকে চিনে গেছে। আদর করে জামাইবাবু বলে ডাকে। মাঝে মধ্যে আদর-আবদার করে বিড়ি-সিগ্রেট-মালের টাকা দাবি করে। হাসি মুখে মোতি কখনো আপত্তি করে না।

একটা বড়ো গাছের তলায় বসে দুজনে। আশে পাশে কপোত-কপোতীর দল। বেশির ভাগই অল্পবয়েসী।

আমার খুব ভালো লাগে তোমার সঙ্গে ঘুরতে। লাজুক কিশোরীর গলায় রেশমা বলে ওঠে। তার নিজেরই অচেনা লাগে নিজের কণ্ঠস্বরে।

মৃদু কণ্ঠে মোতি বলে, ধীরে ধীরে তুমি অনেক পাল্টে যাচ্ছ রেশমা।

আমার নিজের কাছে বিশ্বাস হয় না। নিজেকে চিনতে পারি না।

তোমার বাপের বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে হয় না?

না।

সেকি! নিজের বাপ-মাকে দেখতে মন চায় না?

বললাম তো, না।

মোতি কিছু বলে না। রেশমা নিজে থেকে কিছু বলতে না চাইলে জোর করা বৃথা।

আমি তো ফিরে গেছলাম বাপের বাড়িতে। টিকতে পারলাম না।

মানে? খুব অবাক হয়ে মোতি জিগ্যেস করল।

তোমাকে আমার আগের জীবনের গল্প কখনো করিনি। কিন্তু গত এক বছরে তোমাকে মনে হয় খুব কাছের মানুষ। তোমাকে সব কিছু বলা যায়। ভুল বুঝবে না।

মাথা নাড়ে মোতি। খুব লাজুক ভাবে রেশমার আঙুলের ওপর আঙুল রেখে খেলা করতে থাকে।

আমার বাড়ি বহরমপুরে। মুর্শিদাবাদ জেলায়। বাবা নামকরা বিজনেসম্যান। রুলিং পার্টির সঙ্গে খুব দহরম মহরম। ভালোই ছিল দিনগুলো। ধনী ঘরের আদরের দুলারী। ছেলেবেলা থেকে গান গাইতে ভালোবাসতাম। ভালেই গাইতাম। শহরের ছোটো খাটো ফংশানে গান গাইতাম।

কী ধরনের গান গাইতে?

আধুনিক, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল গীতি। হিন্দি গানও গাইতাম।

তাহলে জীবনে এত বড় সর্বনাশ ঘটলো কী করে?

আমার লোভ। প্রচার আর প্রতিষ্ঠার লোভ। খুব ইচ্ছে হত কলকাতায় যাব, মুম্বাই যাব। রেডিও টিভিতে অনুষ্ঠান করব। ক্যাসটে সিডি হুড়মুড় করে বিক্রি হবে। কলকাতায় রবীন্দ্র সদন, নজরুল মঞ্চ, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে হল ভর্তি মানুষ আমার গান শুনবে। বাংলা হিন্দি সিনেমায় প্লে-ব্যাক গাইব।

গত এক বছরে একদিনও তো দু-কলি গান শোনাওনি জানু। অভিমানী গলায় মোতি বলল। আদর করে রেশমার ডান হাতের তালু মুখের কাছে এনে চুমু খেল।

ওই গান আমাকে সর্বনাশের পথে এনে দিয়েছে।

তাই?

ক্লাশ এইটে পড়তাম। কতটুকু বয়স বলো? বারে কি তেরো। আমার বাবার এক মামাতো বাই লালুকাকু মাঝে মাঝে আসত আমাদের বাড়িতে। আমাকে গান বাজনায় খুব উৎসাহ দিত। সে এক দিন আমাকে লোভ দেখালো কলকাতায় যাওয়ার জন্য। তার নাকি সব চেনা জানা আছে। খুব তাড়াতাড়ি আমার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে।

তার পাল্লায় পড়ে গেলে?

খুব বোকা ছিলাম। অত সহজে কোনো ভাবেই পপুলার হওয়া সম্ভব নয়, সে টুকু বাস্তব বুদ্ধিই ছিল না। লালুকাকুর সঙ্গে একদিন বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চাপলাম। সোজা কলকাতা।

তারপর আকাশবাণী না দূরদর্শন?

ছাই বুঝেছ। ট্যাক্সি চাপিয়ে সিধে সোনাগাছির মাসীর ঘরে। সে নাকি এরকম গ্রামগঞ্জের অল্পবয়সী মেয়েদের চালান করে ভালো রোজগার করত।

এরকম তো ঘটেই থাকে। আড়কাঠিরা বিশেষ করে গরীব মেয়েদের ফুসলিয়ে নিয়ে এসে এই সব জায়গায় বিক্রি করে দেয়। এটাকে বলে হিউম্যান ট্রাফিকিং। খবরের কাগজে সেব নিয়ে নিয়মিত লেখা হয়।

চুপচাপ বসে থাকে দুজনে। আকাশে মেঘ জমেছে। ত্রঞ্জঙ্গছ বয়েসী ছেলে মেয়েরা ঝোপের আড়ালে শরীরের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে। সেই চিরকালের পুরোনো গল্পের পুনরাবৃত্তি।

প্রথম দিকে খুব ভয় পেয়ে গেছলাম। শরীর সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। মাসী খুব মারধোর করত। তার সাফ কথা, টাকা দিয়ে সে আমাকে কিনেছে, কাজেই সে এখন আমার গতরের মালিক। দেহ বিক্রি করে খেতে হবে।

অত ছেলেমানুষ ছিলে তুমি।

শররিটাও তো পরিণত হয়নি। শুনলে হাসবে, আমার মতো ছোটো মেয়েদের যোনিপথ খুব ছোটো থাকত। সেজন্য ছোটো শোলার টুকরো জলে ভিজিয়ে ওখানে গুঁজে দেওয়া হত। জল দেওয়া হত, যাতে ওখানে ওগুলো ফুলে ওঠে। ফলে ছিদ্রটা একটু বড়ো হত।

ছেড়ে দাও। ওসব জঘন্য কার্যকলাপের গল্প আমাকে শোনাতে হবে না।

আমারও কি বলতে ইচ্ছে করে! বুকের ভেতর হাহাকার করা কান্নাও কবে শুকিয়ে গেছে।

বাড়ি ফেরার কথা বলছিলে।

আমার বাবা খুব ক্ষমতাবান মানুষ ছিলেন বলেছিলাম।

বাড়িতে ফিরে দেখলাম, সব কিছু কেমন পাল্টে গেছে। আমার বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিল। ছোটো মফস্‌সল শহর। সকলেই জেনে গেছল। আমার নরক যাত্রার কথা। স্কুল থেকে আমাকে জানানো হল, গার্জেনরা আপত্তি জানাচ্ছে। কাজেই স্কুল বন্ধ। পাড়া পড়শি বন্ধ। বাড়িতেও সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকা। সকলেই আমাকে ঘৃণা করে, অচ্ছুৎ ভাবে। দম আঁটকিয়ে আসছিল। নিজেকেই বোঝালাম, এটাই আমার নিয়তি। মেয়ে মানুষ একবার ঘর থেকে বের হলে তার সর্বনাশ হয়ে যায়। কাজেই এবার নিজের ইচ্ছেতে ঘর ছাড়লাম। সোজা পৌঁছে গেলাম আমার বাঞ্ছিত তীর্থক্ষেত্রে।

লালুকাকুকে চেপে ধরে আমার ঠিকানা জেনেছিল। হোম মিনিস্টারের সাহায্যে পুলিশের মাধ্যমে আমি ছাড়া পেলাম।

তার মানে বাড়ি পৌঁছে গেলে।

হ্যাঁ, তাই তো হল।

তাহলে?

বাড়িতে ফিরে দেখলাম, সব কিছু কেমন পাল্টে গেছে। আমার বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিল। ছোটো মফস্‌সল শহর। সকলেই জেনে গেছল। আমার নরক যাত্রার কথা। স্কুল থেকে আমাকে জানানো হল, গার্জেনরা আপত্তি জানাচ্ছে। কাজেই স্কুল বন্ধ। পাড়া পড়শি বন্ধ। বাড়িতেও সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকা। সকলেই আমাকে ঘৃণা করে, অচ্ছুৎ ভাবে। দম আঁটকিয়ে আসছিল। নিজেকেই বোঝালাম, এটাই আমার নিয়তি। মেয়ে মানুষ একবার ঘর থেকে বের হলে তার সর্বনাশ হয়ে যায়। কাজেই এবার নিজের ইচ্ছেতে ঘর ছাড়লাম। সোজা পৌঁছে গেলাম আমার বাঞ্ছিত তীর্থক্ষেত্রে। গীতামাসীর স্নেহের ছায়ায়। তারপরের গল্প তোমার জানা।

ঘর-সংসার করতে তোমার ইচ্ছে করে না মেয়ে?

আমাকে লোভ দেখাচ্ছ? মিছিমিছি?

আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তোমাকে এখনও ভালোভাবে জানি না। আর এ বড় অজগরের ফাঁস। ইচ্ছে করলেও মুক্তি নেই।

আমার ট্র্যান্সপোর্টের বিজনেস। আমাকে এতদিন ধরে যেটুকু চিনেছ, আমি বাজে কথা বলি না।

গীতামাসীর ও পাড়ার দালালরা সবাই খুনে গুণ্ডা। আমাকে ওখান থেকে মুক্তি দেবে না। তোমাকেও মেরে ফেলতে ওদের হাত কাঁপবে না।

এখন আমাদের ওরা বিশ্বাস করে। পালাবো, এটা ওরা ভাবতেও পারে না।

আমাকে কোথায় নিয়ে তুলবে? তোমার বউ বাচ্চা আছে কিনা তাই ছাই জানি না।

আছে। বর্ধমানে দেশের বাড়িতে। দুই মেয়ে। কলেজে পড়ে। আমার দায়িত্ব কর্তব্য আমি ঠিকঠাক পালন করব। সে নিয়ে কোথাও বিবেকের দংশনের কোনো ভূমিকা নেই।

কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?

শুভদিন দেখে সিনেমায় যাওয়ার নামে ওখান থেকে বের হব। কালীঘাটে কপালে সিঁদুর ছোঁওয়াব। তারপর আমার গাড়ি করে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে সোজা আসানসোল। সেখানে আমার একটা ঘর আছে।

আকাশে জমা হওয়া মেঘ থেকে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল। কাল কিংবা পরশু ওদের জীবনে একটা কিছু ঘটবে হয়তো।

বেঁধে বেঁধে থাকার সেই সব দিন

আব্দুল বারী

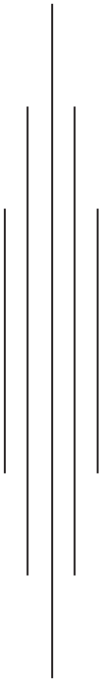

ফাল্গুন মাস চলছে। শীতের জড়তা ঝেড়ে গাছপালা নবপত্রে সেজে উঠেছে। শিমুলে পলাশে কানাকানি। আমের গাছে বোল ধরেছে। কিছু গাছে এখনো মুকুল আছে। অলির গুঞ্জনে আর পাখির কূজনে মুখরিত চারিপাশ। সকালে কুয়াশার চাদরে শীতের প্রলেপ থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রবির তেজে চনমনে হয়ে ওঠে চারদিক। মানুষ তো প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপহার। তাই মানুষের হৃদয়ে লাগে প্রকৃতির ছোঁয়া। সেজে ওঠে মানুষ, গেয়ে ওঠে হৃদয়।

এমনই ফাল্গুনী সন্ধ্যায় ঋষিকেশ মণ্ডল এসে বসে আলতাফ হোসেনের দলিজে। ছায়া ছায়া অন্ধকার, হ্যারিকেনের মৃদু আলো। ঋষিকেশ গানের একটা সুর গুনগুন করে ভেজে নিয়ে থেমে যায়। আলতাফ হোসেন দরাজ গলায় সুরটা চড়িয়ে গেয়ে ওঠে। বাড়িরই দু চারজন মেয়ে পুরুষ এসে বসে যায়। সাথে আসে বাচ্চারাও। বেশ কিছুক্ষণ গান চলে। সুদূর আকাশে তারায় তারায় সুরের ছোঁয়া লাগে। জ্বলে ওঠে তারাও।

কিছুক্ষণ পর গান থামে। আলতাফ হোসেন ছোটদের উদ্দেশ্যে বলে, যাও, তোমরা বাড়ির ভেতরে যাও। পড়তে বস গে। নানার নির্দেশে পিন্টু, মিন্টু, মতিন, বুলি উঠে গেলেও আমি চুপ করে এক পাশে বসে থাকি। আমার বড় ভালো লাগে ওই গান বাজনা আর এদের কথাবার্তা। সেই বয়সে যে সবটা বুঝতাম তা নয়। কিন্তু মনে কেমন এক আবেশ জড়াত। ঋষিকেশ দাদু আসলে সেদিন তো এক অন্য পরিবেশ তৈরি হতো। মনেই হতো না যে মানুষটা পর। আমাদের কাছে ডাকতেন, পাশে বসাতেন। আরো ছোট ছিলাম যখন কোলে বসাতেন। বাড়িময় ঘুরে বেড়াতেন। এ ঘর সে ঘর রান্নাঘর কোথাও তার যাতায়াতে বাধা ছিল না। অবাধে নিঃশঙ্কচে ঘুরে বেড়াতেন।

কতদিন দেখেছি ঋষি দাদু ধামায় করে জমির বেগুন মুলো পটল এনে নামাচ্ছেন নানাদের বাড়ির উঠোনে। গ্রামের

মানুষ আমরাও। নানাদেরও অনেক জমি। সেখানে আনাজের অভাব নাই। তবু ঋষি দাদুর এসব আনা চাই। নানা বলতেন এসব আবার কেন ? নানার দিকে তাকিয়ে ঋষি দাদু বলতেন তুই চুপ তো। আমার নাতি নাতনি মেয়েরা খাবে। তাতে তোর কিরে? তুই চুপ বেটা। তারপর নানির দিকে তাকিয়ে বলতেন, তুমি বলতো লতিফের মা আমি আমার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনির জন্য কিছু আনলে ও বেটার কি হয়? বলতে বলতে হো হো করে প্রাণ খোলা হাসিতে বাড়ি ভরিয়ে দিতেন।

কতদিন দেখেছি এক আসনে বসে রুটি আলু ভাজা খাচ্ছেন দুই দাদু। এক জগ থেকে পানি ঢেলে নিচ্ছেন দুজনে। আমি ছোটবেলায় বুঝতামই না এই লোকটি অন্য ধর্মের। অন্য ধর্মের হলে ছোঁয়াছুঁয়ি থাকে। মানুষে মানুষে দূরত্ব তৈরি হয়। না, তেমন কোন দিন মনে হয়নি। বাতাসে যেমন আমরা ডুবে আছি, মাছ আছে পানিতে; এটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। তেমনি মানুষ থাকবে মানুষের সাথে , সবার সাথে সবাই মিলে মিশে। সেই সময় ঋষি দাদু আর আমার নানার সম্পর্ক ছিল এমনিই।

কতদিন দেখেছি এক আসনে বসে রুটি আলু ভাজা খাচ্ছেন দুই দাদু। এক জগ থেকে পানি ঢেলে নিচ্ছেন দুজনে। আমি ছোটবেলায় বুঝতামই না এই লোকটি অন্য ধর্মের। অন্য ধর্মের হলে ছোঁয়াছুঁয়ি থাকে। মানুষে মানুষে দূরত্ব তৈরি হয়। না, তেমন কোন দিন মনে হয়নি। বাতাসে যেমন আমরা ডুবে আছি, মাছ আছে পানিতে; এটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। তেমনি মানুষ থাকবে মানুষের সাথে , সবার সাথে সবাই মিলে মিশে। সেই সময় ঋষি দাদু আর আমার নানার সম্পর্ক ছিল এমনিই।

ঋষি দাদুর যাওয়ার আগে মা আর নানি নারকেল, লাউ, শিম আতা তে ভর্তি করে দিত ধামা। ঋষি দাদু বলতেন আবার এসব কেন? এবার নানা বাগে পেয়ে বলতেন চুপ, তোর কিরে বেটা, নে চল, মাথায় নে। আমার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি খাবে। অগত্যা মাথায় ধামা আর মুখ জুড়ে চওড়া হাসি। আহা এমন নির্মল প্রাণ খোলা, মন ভালো করা হাসি আর দেখিনা। এখন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে এমন একটু হাসি দেখার জন্য।

সেই সন্ধ্যায় গান শেষে ঋষি দাদু বলেন— আলতাফ এবারের বোলানের পালা লেখা কতদূর হলো ? বেশ জমাটি পালা হওয়া চায় কিন্তু। গতবার আন্ডিরনের পালদের পালার সুনাম হয়েছিল খুব। আমাদের পালাও খুব ভালো ছিল, তবে দু একজনের অভিনয়ে আমরা মার খেয়েছিলাম। তাছাড়া পালরা গেল বার বেশ কিছু নতুন সাজ কিনে এনেছিল বহরমপুর থেকে। নতুন সাজ পরে ওদের মেজাজটা ছিল তুঙ্গে। তাই পেরে ওঠা হয়নি। এবার আমরা সেই ভুল করতে চাই না। পালা যেমন হবে জমাটি তেমনি সাজও হবে জমকালো। কি বলিস?

আলতাফ নানা বলেন আমাদের পালা এবার খুব জমাটি আর সরেস হবে। সীতা মায়ের দুঃখের পাশাপাশি কিছু হাসির রোল থাকবে। রাবণের পার্টটা এবার জয়নুদ্দিনকে দিলে কেমন হয়। যেমন লম্বা চওড়া চেহারা তেমনি বাজখাই গলা। হুংকার দিয়ে আসরে দাঁড়ালে আর মেঘ ডাকা শব্দে হো হো করে হাসি দিলে দর্শকদের বুক কেঁপে যাবে।

ঠিক বলেছিস আলতাফ, এবার জয়নুদ্দিন হবে রাবণ। আর আমার মনে হয় হনুমানের পার্টটা পুন্নুকে দিলে ভালো হয়। ও বেটার হাঁটাচলা, কথা বলার মধ্যে কেমন যেন একটা অন্যরকম ভাব আছে। একটু ছটফটে, একটু দুষ্ট দুষ্ট।

আচ্ছা বেশ তাই হবে। আগে আমি পালাটা শেষ করি। লেখা আর খানিকটা বাকি আছে। আজ নয়, একদিন তোকে সবটা শোনাবো। কিছু সংলাপ এদিক সেদিক করতে হলে করে নেব। আর শোন, এবার ফাগুনের এই প্রথম দিকেই মণ্ডপ তলায় মিটিং ডাক। সবাইকে ডাকবি। আমাদের এ পাড়ার যত মোড়ল মাতব্বর আছে তাদের সবাইকে ডাকবি। মোড়লদের সাথে কিছু অন্য মানুষও যেন থাকে। এবার

একটু বেশি পয়সা দরকার। কিছু নতুন সাজ কিনতে হবে। পালদের হারাতে হবে তো। এই ফাগুনি সন্ধ্যায় সেই চৈত্র শেষের বোলান গানের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত দুই মানুষ।

এই আলোচনা হয়েছিল গত শতাব্দীর সাত এর দশকের শেষের দিকে। মায়ের মুখে শুনেছি, আমার নানা আমাদের জন্মের আগে থেকেই বোলান গান, শব্দ গান করত। আর হিন্দু পাড়ার নানা আনন্দ উৎসবের সঙ্গে জুড়ে থাকতো। জুড়ে থাকতো মানে নানাকে বাদ দিয়ে সেসব কাজ ভাবা যেত না।

আমাদের গ্রামে একটি পাড়ায় অল্প কয়েক ঘর হিন্দুর বাস ছিল। খুব বেশি হলে ৩০ থেকে ৪০ ঘর হবে। এই ৩০-৪০ ঘরের একটি জমাটি পাড়া ছিল সেটা। হিন্দু আর মুসলিম বাড়ি ছিল একেবারে পাশাপাশি। হিন্দু পাড়া আর মুসলিম পাড়ার মধ্যে বড় কোন সীমারেখা ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না। হিন্দু মানুষগুলো তাদের ধর্ম কর্ম আচার বিচার নিয়ে সগর্বে বেঁচে ছিল। তাদের সংস্কৃতি এতটুকু কোনদিন ক্ষুন্ন হয়নি এ গ্রামের সংখ্যাগুরু মুসলিমদের চাপে। বরং বলা যায় তাদের ধর্মাচরণ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন অনেক কাজেই মুসলিমরা ছিল সহায়। মুসলিমদের বাদ দিয়ে তারা তাদের ধর্ম কর্ম ভাবতে পারত না। অল্প কয়েক ঘর হিন্দু মানুষ বাস করায় তাদের একার পক্ষে দুর্গাপূজা করা সম্ভব হতো না। মুসলিমরা টাকা কড়ি থেকে শুরু করে আরো নানা কাজে হাত লাগাত। পুজোর কয়টা দিন সবাই মিলে হৈ হৈ করে আনন্দ করত। পুজোর ঢাকের শব্দে বা কীর্তন গানের সুরে নামাজের কোন দিন অসুবিধা হয়নি। আজান শুরু হলে বা নামাজের সময় হলে ঢাকের বাদ্যি আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যেত। ভয়ে নয়, আন্তরিক তাগিদে। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধায়। কোনদিন যদি আজান বা নামাজের সময় পুজোর তিথি শুরু হত তাতে ঢাক বাজলেও মুসলমানদের গায়ে কোন জ্বালা ধরেনি। নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে মানুষ। এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এর মধ্যে হিংসার কিছু নাই।

সেবার খুব ভালো হয় বোলান গান। দারুন জমাটি পালা। সবাই প্রাণ খুলে অভিনয় করে।কিছু নতুন সাজও কেনা হয়। টাকা আসে মুসলিম পাড়া থেকে বেশি। মানুষ ভাবে বোলান গানের ভালো মন্দ সুনাম দুর্নামের সাথে গ্রাম জড়িয়ে। আর গ্রাম তো শুধুমাত্র ওই পাড়াটুকুই নয়। তাই ভালো কিছু করার লড়াই একা ওই পাড়ার হবে কেন? গোটা গ্রামের, সবার। এ গ্রামের সংখ্যাগুরু মুসলমানরা তাই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এখন দিন বদলেছে। হিন্দু পাড়াটা বাড়েনি। বরং শূন্য দশকের পর থেকে ক্ষয় হতে শুরু করেছে। উভয় ধর্মের মানুষের মনের মাঝে অন্য এক ধরনের ছায়া এসে পড়েছে। সে ছায়া বড় সহজ নয়।

সংসারে থাকলে যেমন হাড়ি কড়ায় বা থালা বাটিতে ঠোকাঠুকি লাগে তেমনি মানুষে মানুষেও লাগে। একই মাঠে জমি। পাশাপাশি বাস। ছাগল গরু আছে। অবাধ সব যাতায়াত। ফলে কিছু নিয়ে তো ঝগড়া লেগে যেতেই পারে। ছামলের ছাড়া গরু গিয়ে প্রাণ গোপালের ফসলে মুখ দিতেই পারে। দেয়ও। কোন কোন দিন বেশ ক্ষতিও হয়। তার বিচারও হয়। দুই পাড়ার মোড়ল মাতব্বর বসে তাদের বিচার করে দেয়। ক্ষতির পরিমাণ দেখে যতটা সম্ভব ন্যায় বিচার করে তারা। ছামল তো আর দাঁড়িয়ে থেকে গরু লাগিয়ে প্রাণ গোপালের ফসল খাওয়ায়নি, অসাবধানে অবলা জীব গিয়ে খেয়ে ফেলেছে। তার জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে উভয়ের মনের মিলন ঘটিয়ে দিত। কেউ তখন ভাবত না যে সে অন্য ধর্মের বলে তার ক্ষতি করতে ফসল খাইয়েছে।

পাশাপাশি জমির আল ঠেলাঠেলি করে কতদিন মাঠে ঝামেলা হয়েছে। কাদান জমিতে আল কাটছে শম্ভু। হানিফ গিয়ে তার কোদাল থামায়। বছর বছর আল কেটে কেটে তুই আমার জমি দখল করছিস। কোদাল থামা। অভিযোগ শুনে শম্ভু রেগে ওঠে। বলে আমার বাবার জমির আলের ঘাস ঝুড়ছি, তাতে তোর কি? আমি কি ভালো করে আবাদ করব না? এক কথা, দু কথা হতে হতে কাদান জমিতে দুজনের হাতা হাতি, মারামারি লেগে যায়। কাদান জমিতে পড়ে কাদা মেখে ভূত হয়ে যায় দুজনে। পাশের জমি থেকে মানুষ এসে ছাড়িয়ে দেয়। তারা জানতো এ বিবাদ এই জমির আল কাটা নিয়ে। এর মধ্যে ধর্ম এসে দাঁড়াতো না। কে সংখ্যায় বেশি কে সংখ্যায় কম এই সংখ্যা তত্ত্বের নীতি বা ধর্মীয় আবেগ কোনদিন ঝগড়ার মধ্যে কেউ আনেনি। ঝামেলা হয়েছে দুজনের, তা মিটিয়ে দেবে পাঁচজনে। এইতো ব্যাপার। সংসারে কি ঝগড়া হয় না স্বামী-স্ত্রীতে বা ছেলেতে ছেলেতে? ভাইয়ে ভাইয়েও হয়। তার মাঝে কি ধর্ম থাকে ? তবে।

এমন তো হতেই পারে। এটাই ছিল তাদের ভাবনা।

এখন দিন বদলেছে। কথায় কথায় ধর্ম এসে দাঁড়ায়। অন্যরকম রোখে, টোনে গলা বেজে ওঠে। মানুষ কেমন যেন যান্ত্রিক। অন্যের ইশারায় নাচা পুতুল।

সেবার কার্তিকের এক সকালে সিতু মোড়লের কাছে এসে পিপল মন্ডল বলে চাচা আর তো বুঝি আমার মেয়ের বিয়ে হলো না গো।

কেন?

টাকা পয়সায় কুলিয়ে উঠতে পারছিনা।

কন্যা দায়গ্রস্ত পিতার করুন সুর বেজে ওঠে।

সিতু মোড়ল বলে এই ব্যাটা মেয়ে কি তোর একার? আমরা কি কেউ নই ? আমরা থাকতে তোর মেয়ের বিয়ে হবে না ভাবলি কি করে? যা বাড়ি গিয়ে বৌমার সঙ্গে পরামর্শ কর গা। কি কি জোগাড় হয়েছে আর কি কি হয়নি তার ফর্দ কর গা। যা জোগাড় হয়নি সেই ফর্দটা আমাকে এনে দিবি।

সিতু মোড়ল যে খুব বড়লোক ছিল তা নয়। সে একা সব জোগাড় করে দেবে সে সাধ্যও তার নেই। কিন্তু আছে খুব বড় একটা মন। সেই মন নিয়ে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে যতটা সম্ভব জোগাড় করে দেবে সে। এমন কত দিয়েছে আগে।

মানুষকে এভাবে আশ্বাস দেওয়া , মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানুষের বড় অভাব এখন। মানুষ বড় কাঁদছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'দাঁড়াও' কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। মানুষ বড় কাঁদছে, তার পাশে দাঁড়াবার কেউ নাই। হেসে ভালোবেসে তার পাশে কেউ দাঁড়াচ্ছে না। পাখির মতো তো নয়ই। বরং মানুষই ফাঁদ পাতছে। অদ্ভুত আঁধারে ঢেকেছে আজ গ্রামের সমাজকে। ধর্মের এক তরল আবেগ নেশার মতো মানুষের মস্তিষ্কে জমতে শুরু করেছে।

কই গো মা জননী কোথায় গো? আমি এসেছি, দাও চাল, টাকা যা দিবা দাও। উঠোনের মাঝে আধ ময়লা খাটো ধুতি পরা একটা লোক। বাম হাতের মাঝের তিনটে আঙ্গুল অর্ধেক করে নাই। যেটুকু আছে তাও বাঁকা। হাতে একটা লাঠি ধরা, কাঁধে ঝোলা। তাতে যে চাল আছে তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

মা ঘর থেকে বেরিয়ে বলে—কাকা এদিকে এসো। বারান্দার উপর এসে বস। লোকটা বলে না মা , না আজ বসবো না। এখনো পাঁচ বাড়ি যাব। বেলা মাথার উপর উঠছে। মা আবারও বলে—দে তো তোর দাদুকে ওই পেয়ারা তলায় একটা টুল দে। কাঁধের ঝোলাটা রেখে একটু বসো ওই ছায়ায়। আমার বাড়ি এসেছো দুটো না খেতে দিয়ে কি ছাড়তে পারি? আমার নানার বাড়ি গ্রামেই। তাই লোকটার সঙ্গে মায়ের পরিচয় অনেক দিনের। নানাদের বাড়িতে অনেক আগে থেকেই লোকটার আসা যাওয়া। যথেষ্ট খাতির ভক্তির সঙ্গেই এই মানুষটিকে দেখা হত। মা বলতো নানাদের দলিজে বসে কতদিন এই লোকটা কত গল্প শুনিয়েছে। রাত জেগে হাঁক দেওয়ার সময় কত রকম কি আজগুবি জিনিস দেখেছে তার গল্প বলতো। সেই ছেলে মানুষ বয়স থেকেই মানুষটিকে চেনে মা।

লোকটি পেয়ারা তলায় টুলের উপর বসে। পাশে নামিয়ে রাখে কাঁধের ঝোলা। মা ঘর থেকে থালায় করে মুড়ি, বাতাসা , হালুয়া এনে দেয়। কাঁসার গ্লাসে দেয় পানি। আমি লোকটিকে চিনতে পারি। হাঁক দাদু। রমজান মাস জুড়ে ভোর রাতে হাঁক দিয়ে মানুষ জাগিয়ে যায়। তার ডাকেই ভোর রাতে

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি। ম্লান চাঁদের আলোয় অলস শুয়ে আছে গ্রাম। রাত জাগা পাখি একটু ডানা ঝেড়ে আবার চোখ বুজে। সারাদিন রোজা করে থাকা মানুষ কেমন এক ক্লান্তিতে ঘুমের অতল গহ্বরে ডুবে আছে। ঠিক এমন সময় গ্রামের এক প্রান্ত থেকে হাঁক শুরু করে হাঁক দাদু। নিঝুম রাতের উপর দিয়ে ভেসে আসে এক সুরেলা ডাক। মইজুদ্দিন চাচা আ আ আ ভাত চড়াও ও ও। অনেক দূর থেকে, যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে সুরটা ভেসে ভেসে আসতে থাকে।

মানুষ ঘুম থেকে উঠে সেহেরি রান্না করে। মাঝরাত পার করে ভোরের আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এক হাতে লাঠি আর অন্য হাতে হ্যারিকেন। লাঠিটা বেশ পাকা আর বেত দিয়ে বাঁধানো। শুধু রাতে হাঁকের সময়ই নয় সারাদিন যেখানেই যায় এই লাঠিটি তার হাতে থাকে।

নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি। ম্লান চাঁদের আলোয় অলস শুয়ে আছে গ্রাম। রাত জাগা পাখি একটু ডানা ঝেড়ে আবার চোখ বুজে। সারাদিন রোজা করে থাকা মানুষ কেমন এক ক্লান্তিতে ঘুমের অতল গহ্বরে ডুবে আছে। ঠিক এমন সময় গ্রামের এক প্রান্ত থেকে হাঁক শুরু করে হাঁক দাদু। নিঝুম রাতের উপর দিয়ে ভেসে আসে এক সুরেলা ডাক। মইজুদ্দিন চাচা আ আ আ ভাত চড়াও ও ও। অনেক দূর থেকে, যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে সুরটা ভেসে ভেসে আসতে থাকে। তারপর ক্রমশ সুরটা কাছে আসে। চড়া হয়। লতনি পাড়ার কাছাকাছি হাঁকটা এলে দুটো কুকুর চিৎকার করে ওঠে। হাতের লাঠিটা তুলে ছেই ছেই হাট হাট করে কয়েকবার চিৎকার দিয়ে আবার হাঁক শুরু করে। আমাদের বাড়ির কাছে এসে জামাই বাবু গো ও জামাইবাবু ....। একটু যেন দাঁড়িয়ে যায় আমাদের বাড়ির সামনে। তারপর আবার এখান থেকেই হাঁক ছাড়ে ইয়াদালি চাচা ও ইয়াদালী চাচা আ আ ভাত চড়াও। তার হাঁকে জেগে ওঠে পাড়া, জেগে ওঠে গ্রাম।

বাড়িতে বাড়িতে ঘুম থেকে সদ্য জেগে ওঠা মানুষের কথাবার্তা। হাঁড়ি কড়াই এর শব্দ। মড়মড় করে পাটকাঠি ভাঙছে কেউ, কেউবা সরু সরু শুকনো ডাল মট মট করে ভেঙ্গে ঢোকাচ্ছে উনুনে। জ্বলে উঠছে আগুন। অধিকাংশ বাড়িতে তখন রান্নাঘর উঠোনের পাশে একটা চালা। কারো বা উপরে একটা ছাউনি থাকলেও তিন দিক ফাঁকা। অন্ধকার ভেদ করে জ্বলতে থাকে আগুন। পাশের বাড়ির মানুষ দেখতে পায় সে আগুন। শুনতে পায় পাটকাঠি বা ডাল ভাঙ্গার শব্দ। মানুষ পাশের বাড়ির আগুন জ্বলছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখত। না জ্বললে বুঝতো চেতন পাইনি। এসে ডেকে দিয়ে যেত। এখন সব রান্নাঘর চার দেওয়াল ঘেরা। গ্যাস ওভেনে রান্না। ঘরের মধ্যে কেউ রাঁধছে কিনা বাইরে থেকে দেখা যায় না। বোঝা যায় না। কেউ ডাক দেওয়ার তাগিদও অনুভব করে না। মানুষ বড় আত্মকেন্দ্রিক।

এত সতর্কতার পরেও যদি কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠতে না পারতো বা যখন জেগে উঠেছে তখন ভাত রান্না করার মত আর সময় নাই, ভাত রাঁধতে গেলে ফজরের আজান হয়ে যাবে। তখন তাদের অবস্থা পাশের বাড়ির লোক জানতে পারলে থালা থালা ভাত এনে দিত। তখনকার দিনে প্রতিটা বাড়িতে অনেকগুলো করে ছোট ছোট বাচ্চাকাচ্চা থাকত। তাদের সকালে খাওয়ার জন্য ভোর রাতে একটু বেশি করে চাল দিয়ে ভাত রান্না করে রাখা হত। পাঁচ থালা ভাত পাশের বাড়িতে দিলেও কোন অসুবিধা ছিল না। সকালে বাচ্চাদের জন্য একটু ফুটিয়ে দিলেই হল। এখন মানুষগুলো তো খেয়ে রোজা করুক। আর এই রোজা রাখার সওয়াব (পুণ্য) যে ভাত দিচ্ছে সেও পাবে। এ তো বড়ো ভাগ্যের কথা। মানুষের ধর্ম বোধ ছিল খুব সুন্দর। সামাজিক বন্ধন ছিল অত্যন্ত মজবুত। একে অপরের একটু উপকারে যদি না লাগে তবে কিসের সমাজ, কিসের ধর্ম?

এখন দিনকাল পাল্টেছে। কেউ একমুঠো চাল বেশি রান্না করে না। এমনকি সাধারণ দিনেও তো করে না, রমজানের ভোরের কথা তো দূরে থাক। এখন ফকির মিসকিন এক মুঠো ভাত চাইলে মানুষ বিরক্ত হয়। শহুরে লোকের মতো মাপা চালের ভাত রান্না হয়। কেউ এক মুঠো চাইলে পাবে না। আগের দিনে গৃহস্থ মানুষের হাঁড়িতে সব সময় দুই একটা মানুষের খাওয়ার মতো ভাত থাকতো। হাঁস মুরগি গরু ছাগলে খেতো।

হাঁক দাদুর খাওয়া শেষ হলে মা বেশ করে চাল আর পয়সা দিত দাদুর হাতে। দাদু আশীর্বাদ করতে করতে চলে যেত। রমজান শেষে ঈদের পর হাঁক দাদু এসে এভাবে চাল পয়সা নিয়ে যেত। একজন হিন্দু মানুষের হাঁকে জেগে উঠে রোজা করার জন্য ভাত রান্না করত মানুষ। ধর্মপ্রাণ মুসলমান মানুষদের ধর্ম পালনের সহায় একজন হিন্দু। এতে হাদিস কোরআনের কোন বাধা ছিল না, ছিল না মানুষের মনে কোন দ্বিধা বা বাধা।

এসব কথা গত শতাব্দীর সাত এর দশকের। তারও আগের থেকে এই ব্যবস্থা চালু ছিল। আটের দশকের শেষে মসজিদের মিনারে মাইক বাঁধা হয়। মাইকে আজান দেওয়া শুরু করে। তবে মাইক আসলেও হাঁকদাদু যতদিন বেঁচে ছিল রমজানের ভোরে তার হাঁকেই মানুষ জাগত। এখন

আমাদের গ্রামের হিন্দু পাড়াটা এখনো আছে। আগেই বলেছি পাড়াটা বাড়েনি। বরং কমেছে। আর বিপরীতে বেড়েছে মুসলিম পাড়া। চারিদিক থেকে আরও প্রসারিত হয়েছে মুসলমানদের বাড়িঘর। এই শতাব্দীর শূন্য দশক থেকে কিছু কিছু হিন্দু মানুষ পাড়া ছেড়ে চলে যেতে থাকে কোন এক অজ্ঞাত কারণে। তবে মুসলমানদের অত্যাচারে কিন্তু নয়। কারণ এখনো যারা আছে তারা পঞ্চমুখে মুসলিমদের প্রশংসা করে। তাদের উঠে যাওয়ার একটি কারণ মনে হয় ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়ার অসুবিধা।

তার জায়গা নিয়েছে মসজিদের মাইক আর মোবাইলের অ্যালার্ম। অর্থাৎ যন্ত্র। রমজানে ভোরে মাইকে গজল বাজে। দীর্ঘক্ষণ বাজতেই থাকে বাজতেই থাকে।

আমাদের গ্রামের হিন্দু পাড়াটা এখনো আছে। আগেই বলেছি পাড়াটা বাড়েনি। বরং কমেছে। আর বিপরীতে বেড়েছে মুসলিম পাড়া। চারিদিক থেকে আরও প্রসারিত হয়েছে মুসলমানদের বাড়িঘর। এই শতাব্দীর শূন্য দশক থেকে কিছু কিছু হিন্দু মানুষ পাড়া ছেড়ে চলে যেতে থাকে কোন এক অজ্ঞাত কারণে। তবে মুসলমানদের অত্যাচারে কিন্তু নয়। কারণ এখনো যারা আছে তারা পঞ্চমুখে মুসলিমদের প্রশংসা করে। তাদের উঠে যাওয়ার একটি কারণ মনে হয় ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়ার অসুবিধা। বাইরে থেকে লোকজন বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসে দেখে চারিদিকে শুধু মুসলিমদের বাস আর মাঝে কয় ঘর হিন্দু। তারা বলে এখানে থেকে জাত ধর্ম রাখা খুব কঠিন। পূজা পার্বণ ঠিক হবে না। ছোঁয়াছুঁয়ি লেগে যাবে। এখানে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নরক বাস করতে তারা পারবে না। কিছু মানুষ ভালো জায়গায় ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার তাগিদে সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে পালায়। তবে শুনেছি যে গ্রামে উঠে গেছে সেখানে স্বজাতির অত্যাচারে নাকি তারা অতিষ্ঠ। এখানকার মতো বাস করে সেখানে নাকি শান্তি হয় না। মাঝে মাঝে এসে এসব দুঃখের কাঁদুনে গেয়ে যায় তারা। আসলে আমাদের গ্রামের যে সমস্ত হিন্দুরা বাস করে তারা বর্ণে একটু নিম্ন। তাই অন্য গ্রামের উচ্চ বর্ণের সঙ্গে তাদের যেন ঠিক মিল হত না।

হিন্দুদের পাড়া ছেড়ে চলে যাবার আরেকটি কারণ মনে হয় এখানকার জায়গা জমির প্রচুর দাম। মুসলিমরা অনেকেই চুলের ব্যবসা করে হাতে বেশ কিছু পয়সা জমিয়েছে। আর আমাদের গ্রামটিও রাস্তার উপর। ব্যবসা করার অনেক সুযোগ সুবিধা আছে। তাই জায়গার দাম প্রচুর। এ কারণেও অনেকেই জায়গা জমি বিক্রি করে অন্যত্রে চলে যাচ্ছে।

দশকের পর দশক ধরে আমাদের গ্রামের হিন্দু মানুষগুলোকে মুসলমানরা অত্যন্ত ভালোবেসে আগলে রেখেছে। কয়েক ঘর মানুষ তারা বাস করছে বলে মুসলমানরা তাদের উপর জুলুম করেছে একথা যেন তারা বলতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। বরং মুসলমানদের স্বার্থে আঘাত লাগলেও হিন্দুদের যেন কোন ক্ষতি না হয় তা ভেবেছে।

দীর্ঘদিন ধরে সংস্কৃতির সমন্বয় মানুষকে সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছে। একসাথে বেঁধে বেঁধে থাকার মন্ত্র পেয়েছে। ও পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এ পাড়ায় এসে পড়াশোনা শিখে মানুষ হয়েছে। আমাদের বাড়িতেই ও পাড়ার মল্লিকা, শিখা, রিয়া, সঞ্চিতা, রেখার হাতে খড়ি হয়েছে।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে ওই একদল মেয়ে আসত আমাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়তে। তার আগেও অবশ্য অনেকেই এসেছে। এই সব ছোট ছোট মেয়েরা তখনও বর্ণ পরিচয় ঠিকমতো শেখেনি। বিদ্যাসাগরকে বুকে ধরে আমাদের বাড়ি আসতো। বাড়িময় ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। আমাদের বাড়ির পিছন দিকে একটা শিউলি গাছ ছিল। ভোরবেলা শিউলি পড়ে গাছের তলা আলো হয়ে থাকতো। মল্লিকা খুব ফুল ভালোবাসত। রোজ সকালে এসে আগে শিউলি কুড়াত। কোনদিন ব্যাগে পুরে রাখতো, কোনদিন এক ছুটে বাড়ি গিয়ে রেখে আসতো। তার দেখাদেখি অন্য মেয়েরাও ফুল

কুড়াতে থাকে। একসময় ফুল কুড়ানোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কে কত বেশি ফুল কুড়াতে পারে। মল্লিকা সবার আগে এসে ফুল কুড়াত।

এমন অনেক দিন হয়েছে আমাদের বাড়ির মা ছাড়া কেউ জাগেনি। মল্লিকা চলে এসেছে। ফুল কুড়িয়ে ব্যাগ ভর্তি করেছে। ফজরের নামাজ পড়ে মা বসে আছে। মায়ের পাশে এসে বসেছে মল্লিকা। কথা বলে চলেছে অনর্গল। ফুলের মত সুন্দর ছিল সে। প্রসন্ন ভোরে দুই অসমবয়সী মানুষ কথা বলে চলেছে। চারিদিকে আলো ফুটে উঠছে। তারপর একে একে আরো মেয়েরা এসে হাজির হচ্ছে।

মল্লিকা ছিল ঋষি মোড়লের নাতির মেয়ে। সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী ছিল সে। আমাদের বাড়িতে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করে গেছে। তারপর একদিন বিয়ে হয়ে যায়। সুন্দরী মেয়েদের উপর বুঝি কোন অভিশাপ থাকে। বেশি দিন স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না তারা।

কয়েক বছর আগে হঠাৎ শুনি মল্লিকা শ্বশুর বাড়িতে গায়ে আগুন দিয়ে মারা গেছে। মা ভীষণ কষ্ট পায়। ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। স্বজন হারানোর বেদনায় মা যেন কাতর। বাড়িতে কোন ভালো খাবার হলে মা মল্লিকার জন্য রেখে দিত। সব মেয়েদেরকেই পিঠে, তাল বড়া, হালুয়া দিত। তবে মল্লিকা কে একটু বেশি। সেই মেয়ে মারা গেলো। মা বেশ কয়েকদিন বিষণ্ণ মনে থাকল। কেমন আনমনা। নীরব। চলাফেরায় ধীর। বেশ কয়েকদিন লাগে শোক সামলে উঠতে।

এখন মল্লিকাও নাই, সেই শিউলি গাছটাও নাই। কিন্তু কথায় কথায় কোনদিন শিউলি গাছটার কথা উঠলে মা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়।

ও পাড়ার সব মানুষদের সঙ্গে এপাড়ার মানুষদের ঠিক এমনই নাড়ির যোগ ছিল।

মণ্ডপের সামনের বটতলায় জোর তর্ক বেঁধেছে। সুধীর মণ্ডল বলে লাঠি খেলায় ওস্তাদ হলো শের মোহাম্মদ। বোঝায় করা ধানের গরুর গাড়ি যে যাঁত চাপা দিয়ে আনা হয় সেই লম্বা যাঁত কি অবলীলায় শের মোহাম্মদ ঘোরায়। শুধু ঘোরায় না বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে কখনো শূন্যে ছেড়ে দেয়। কখনো দুই আঙ্গুলের ডগায় ঘোরাতে থাকে। ওই হল ওস্তাদ খেলোয়াড়।

উম্মত শেখ মানতে চায় না। সেও একজন ভালো লাঠি খেলোয়াড়। সে বলে পতু শেখ হল লাঠি খেলার আসল ওস্তাদ। শের মোহাম্মদ শুধু যাঁত ঘোরাতে পারে, কিন্তু ছয় ফুট লাঠি নিয়ে পতু যে পাঁয়তারা দেখাতে পারে তা কি শের মহম্মদ পারবে? পতুর হাতে লাঠি কথা কয়। এমন ছন্দে সে লাঠি খেলে, বাজনার তালে তালে এমন করে পা তোলে তা দেখার মতো। বাহবা দিতেই হবে পতুকে।

সুধীর বলে দূর, ওই পুঁচকে লাঠি দিয়ে পতুর যত পাঁয়তারা, লম্ফঝম্প। পারবে, পতু পারবে ওই ভারি যাঁত নিয়ে কসরত করতে। দম বেরিয়ে যাবে।

দূর দূর, যাঁত ঘোরানো কি কোন খেলা হল? ধারালো তরবারি নিয়ে পায়রার মত পলটবাজি মারতে পারবে তোমার ঐ শের মহম্মদ।

বেশ কয়েকজন মানুষ বটতলায় বসেছিল। এদের তর্ক শুনছিল। আরো কয়েকজন পথ চলতি মানুষ দাঁড়িয়ে যায়। এদের মাঝ থেকে মধু বলে থামো থামো কাকা, তোমরা থামো। চাল্লিশা তো আর কয়দিন পরেই। তখন মীমাংসা হয়ে যাবে কে বড় খেলোয়াড়।

ইয়াসিন বলে ঠিক ঠিক। আর তো কয়দিন। মহররমের দিন চলে গেল। ঢোলে বাড়িও পড়ে গেছে। মহরমের চল্লিশ দিন পর চাল্লিশা হয়। আর কয়দিন পরেই চাল্লিশা।

খুব ছোটবেলা থেকে দেখছি আমাদের গ্রামে চল্লিশা উপলক্ষে লাঠি খেলা হয়। গ্রামেই এক ঘর মুচির বাস। শম্ভুমুচি। দারুন ঢোল বাজাত। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঢোল বাজাত নজির শেখ। একদিকে ঘাড়কাত করে চমৎকার ঢোল বাজাতে পারতো নজীর চাচা।

চাল্লিশার দুদিন আগে থেকেই পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি লাঠিখেলা যেত। বাড়ির বড় উঠোনে বা তেমাথার পথের উপর ফাঁকা জায়গায় খেলা হত। মেয়েরা দূর থেকে কখনো বা একপাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতো। বাড়ির লোক টাকা পয়সা দিত।

খেলা যেত হিন্দু পাড়ায়ও। মন্দিরের পাশে বড় ফাঁকা জায়গায় খেলা হতো। সুধীর মণ্ডলের বড়ো উঠোন। সেখানে খেলতেই হবে। প্রাণ, গোপাল, বাদল, পদা এদের উঠোনে না খেললে রাগ করত।

ছোটবেলায় দেখতাম সুধীর মণ্ডলের উঠোনে খেলা হচ্ছে। পাড়ার মেয়েরা ভিড় করে খেলা দেখছে। হিন্দু মুসলমান সব মেয়েই আছে। দেখতাম হাতে শাঁখা আর কপালে জ্বল

জ্বলে সিঁদুর নিয়ে মগ্ন হয়ে খেলা দেখছে হিন্দু পাড়ার মেয়ে বউরা। আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লতিফন, জায়রা, সুভাতন। তাদের সবার মুখে এক অনাবিল হাসি। কখনো হেসে একে অপরের উপর গড়িয়ে পড়ছে। যখন শের মোহাম্মদ বন বন করে যাঁত ঘোরাত, স্তম্ভিত হয়ে দেখত সবাই। অনেকে ভয় পেতো। এই বুঝি হাত থেকে যাঁত ছিটকে এসে সবার ঘাড়ে পড়ে।

সেবার পদা তো রেগে আগুন। বাদলের (ঋষি মণ্ডলের ছেলে) বাড়িতে খেলা হলো আর আমার বাড়িতে হলো না কেন? পতু শেখ তাকে বোঝায় দেখ ভাই পদা, তোর উঠোনে আমরা তো খেলতেই এসেছিলাম। বাদলের বাড়িতে খেলতে খেলতে বিপদটা কেমন ঘটে গেল বল। ঈমানের হাতের হেতির (তরবারি) ছিটকে গিয়ে লাগলো নুর হকের হাতে। অনেকটা কেটে গেল। তাকে হাসপাতাল নিয়ে যেতে হল। খেলাটার তাল কেটে গেল। তাই এবছর তোর উঠোনে যাওয়া গেল না ভাই, তুই রাগ করিস না।

আর একটা জিনিস নিয়ে আমাদের পাড়ার মানুষ যেত হিন্দু পাড়ায়। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তো খাওয়া পরায় কোন বাধা ছিল না। বিবাহ, অন্নপ্রাশন জন্মদিন, ঈদ পরব, শ্রাদ্ধ সব অনুষ্ঠানে যে যাকে নিমন্ত্রণ করত সে তার বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেত। খুব বেশি না করত না কেউ। এসব তো সারা বছর ছিলই। বছরে দুই দিন জারি গান নিয়ে যেত ফরু সেখ। ১২-১৪ বছরের ছেলেদের নিয়ে সে জারিগানের দল করতো। মহরমের দিন, আর তারপরের দিন সারা গায়ে বাড়ি বাড়ি জারি গান করে বেড়াতো সে। খুব সুন্দর গলা ছিল ফরুর। সে সুর করে কারবালার ময়দানের করুন কাহিনী বর্ণনা করত আর মাঝে মাঝে সারিবদ্ধ ছেলেরা বুক চাপড়ে দোয়ার ধরতো। এই ছেলেদের পোশাক থাকতো একই ধরনের।।

এই জারি গানের দল নিয়ে ফরু যেত হিন্দু পাড়ায়। এমনিতেই সাধারণ ছেলে-মেয়ে বউ ঝিরা ফরুর জারি গান পছন্দ তো করতই; মা, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা বয়সি লোকেরা আরও বেশি পছন্দ করত। জারি শুনতে শুনতে কখনো কখনো তারাও অঝোর ধারায় কাঁদতো। হোসেনের করুন পরিণতি, সীমার তার বুকের উপর বসেছে, ছুরি চালাচ্ছে কিংবা ফুরাত নদী এজিদের বাহিনী ঘিরে রেখেছে, এক ফোঁটা পানিও দিচ্ছে না, তপ্ত মরুর বুকে ছোট ছোট বাচ্চারা পানি পানি করে ছটফট ছটফট করছে। তৃষ্ণায় তাদের বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। গলা দিয়ে কান্নাও আর বের হচ্ছে না। এই দৃশ্যের বর্ণনা শুনতে শুনতে চোখের পানি ধরে রাখতে পারতো না অনেকেই। ফুরুর জারি গান শেষ হওয়ার পরেও পাড়া জুড়ে, গ্রাম জুড়ে এক করুণ মাতম বাতাসে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াতো। কেমন এক উদাস বিষণ্ণতা ছেয়ে থাকতো গ্রাম জুড়ে।

এক সময় তাবলীগ জামাতের প্রবল চাপে লাঠি খেলা ও জারি গান বন্ধ হয়ে যায়। তারা বুঝিয়েছিল এটা কোন ধর্ম নয়। কিছু দেশ চলিত, রীতি রেওয়াজ। বেশ কিছুকাল লাঠি খেলা বন্ধ থাকার পর এখন আবার মাঝে মাঝে খেলা হয়। তবে লাঠি খেলার আগের মত সেই ঐতিহ্য, বিশুদ্ধতা নাই। সেই সব মানুষদের

ছোটবেলায় দেখতাম সুধীর মণ্ডলের উঠোনে খেলা হচ্ছে। পাড়ার মেয়েরা ভিড় করে খেলা দেখছে। হিন্দু মুসলমান সব মেয়েই আছে। দেখতাম হাতে শাঁখা আর কপালে জ্বল জ্বলে সিঁদুর নিয়ে মগ্ন হয়ে খেলা দেখছে হিন্দু পাড়ার মেয়ে বউরা। আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লতিফন, জায়রা, সুভাতন। তাদের সবার মুখে এক অনাবিল হাসি। কখনো হেসে একে অপরের উপর গড়িয়ে পড়ছে। যখন শের মোহাম্মদ বন বন করে যাঁত ঘোরাত, স্তম্ভিত হয়ে দেখত সবাই। অনেকে ভয় পেতো। এই বুঝি হাত থেকে যাঁত ছিটকে এসে সবার ঘাড়ে পড়ে।

খেলার মধ্যে একটা শিল্প ছিল। এখন বেতালে লাঠি চলে। তার থেকে বেশি হয় নাচন কুদন। কেউ কেউ মদ খেয়ে দলে ভিড়ে বাজনার তালে তালে এলানো পায়ে নাচতে থাকে।

জারি গান এখন একেবারেই হয় না। ফরু সেখ এখন আর জারি গানের দল করে না। কোনদিন বললে তার বাড়ির উঠোনের কোণে জিয়ালা তলায় বসে গুনগুন করে খানিক শুনিয়ে দেয়। তারপর স্তব্ধ হয়ে যায়। আমার দিকে তাকিয়ে ভেজা গলায় বলে —ভাই পারবো না গো, আমি আর পারবো না।

হিন্দু পাড়ার মাঝে একটা মন্দির ছিল। সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, একপাশে একটা বটগাছ। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়ে মন্দির। রং ঝরে যায়, প্লাস্টার খসে পড়ে। কয়েক বছর আগে ভোটের সময় কোন এক নেতা এসে কথা দিয়ে যায় মন্দির সংস্কার করার টাকা সে দেবে। বদলে পাড়ার সব ভোট তার পার্টিকে দিতে হবে। এরকম নাকি কথা হয়। জানিনা কথাটা কতটা সত্যি। তবে ভোটের পরে মন্দিরের সংস্কার শুরু হয়। শ্রী ফিরে মন্দিরের। ধর্মের ভিতরে ঢুকে পড়ে রাজনীতি। মানুষের মনেও।

১৯৮৮ সালে ২৪ শে জুন মুর্শিদাবাদের লালবাগে কাটরা মসজিদে শুক্রবারে নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে ঝামেলা হয়। বেশ কিছু মুসলিম মানুষ নামাজ পড়তে গিয়ে মারা পড়েন। কিছু হিন্দুদের বাড়ি ও দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাট হয়। নামাজ পড়তে গিয়ে শহীদ হওয়া মানুষদের মধ্যে একজন ছিল আমাদের পাশের গ্রামের। এরকম একটা ঘটনার পরেও হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক অটুট ছিল। মোড়ল মাতব্বররা বলে দেয়, কোথায় কোন দূরে ঝামেলা হয়েছে, কার হাতে কে মরেছে তাই নিয়ে আমরা কেন অশান্তি করব। এখানে যারা আছে সবাই তো আমাদের চেনা মানুষ, জানা মানুষ। আপনজন। কেউ কাকা, কেউ দাদু, ভাই ভাইপো। এরা আমাদের আপন লোক। মানুষের মনে কোন চিড় ধরেনা। আপনজনের আসন অটুট থাকে।

১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় ভাঙ্গা হয় বাবরি মসজিদ। সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। বাইরের প্রদেশে দাঙ্গাও হয়। তবে আমাদের গ্রাম যেমন ছিল তেমনি থাকে। নিথর, নিস্তরঙ্গ। দীর্ঘদিনের সংস্কৃতির সমন্বয়ের সুতোটা এতোটুকু পল খায়নি। মজবুতভাবে পাকে পাকে বাঁধা থাকে।

এর আগে ১৯৯০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এল, কে আডবানির নেতৃত্বে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির থেকে রথযাত্রার সূচনা হয়। সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করে রথ। পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়েও যায় সেই রথ। আঞ্চলিকভাবেও অনেক রথ বের হয়। আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে এমনি একটি রথ যায়। অল্প কিছু মানুষ একটা গাড়িকে রথ বানিয়ে কিছু ট্যাবলো সহযোগে সংকীর্তন করতে করতে ধীর গতিতে চলে যায়। রাস্তার দুপাশে বেশ কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে রথযাত্রা দেখে। মানুষের মনে তখনো তেমন কোন প্রভাব পড়ে না। তবে ঘটনাগুলো একের পর এক ঘটতে থাকে।

১৯৯৮ সালের পর গো বলয়ে গৈরিক ঝড় উঠে। ১৯৯৯ সালে মজবুতভাবে ক্ষমতায় আসে অটলবিহারী বাজপেয়ী। গো বলয়ে গৈরিক ঝড় উঠলেও আমাদের গ্রামীণ জীবনে কোন ঝড় ওঠেনি। পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু অংশ উত্তাল হতে পারে কিন্তু আমাদের গ্রামীণ জীবন ছিল শান্ত। বিশেষ করে আমাদের গ্রাম। তখন মল্লিকা, রেখা, সঞ্চিতা আমাদের উঠোনময় ছুটে বেড়াচ্ছে, শিউলি কুড়াচ্ছে।

এই শতাব্দীর একের দশকে কিছু কিছু ঘটনা মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু মানুষের মনে। গো রক্ষার নামে মানুষকে পিটিয়ে মারা, লাভ জিহাদের নামে চরম নির্যাতন চালানো, মানুষের মনে ভয় ঢুকায়। ট্রেনে বাসে কর্মক্ষেত্রে কেমন বাঁকা চোখে দেখা হয় সংখ্যালঘুদের। মাঝে মাঝে অনেকেই সহকর্মীর কাছে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের মুখে পড়ে। এরপর আসে এন আর সি। এন আর সি মানুষের হাড়-মজ্জায় ভয় ধরায়। সংখ্যালঘু মানুষকে অস্থির করে তোলে। বাইরের রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া ছেলেরা গ্রামে ফিরে তাদের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলে। নিরাপত্তাহীনতা , দেশ হারানোর ভয় মানুষকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। করে তোলে আতঙ্কিত।

বহুদিন ধরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির সমন্বয়ের উপর একের পর এক এইসব ঘটনা আছড়ে পড়তে থাকে। গ্রামীণ সমাজের ঐক্য ভাঙ্গনের মুখে পড়ে। প্রবীণ মানুষদের রক্তে সমন্বয়ের সুর বাজলেও নবীনদের মাঝে তার তাল কাটে। (ক্রমশ)

বাঙালি ও বাঙালি মুসলমান

'আপনি মুসলমান? আমি তো ভেবেছিলাম বাঙালি!' হ্যাঁ, বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানের অধিকাংশের জীবনে আবশ্যিকভাবে দু'একবার শোনা এই বাক্যবন্ধ দিয়েই তাঁর সাম্প্রতিক পুস্তক 'বাঙালি ও মুসলমান' আরম্ভ করেছেন মইনুল হাসান। সুলেখক, বিশিষ্ট রাজনীতিক, মননশীল প্রাবন্ধিক —বিশেষত এই বঙ্গের মুসলিম সমাজের অবস্থান, তার পশ্চাদপদতা এবং উত্তরণ ভাবনা নিয়ে তাঁর লেখালেখি বঙ্গসমাজে যথেষ্ট পরিচিত। তাঁর নিজস্ব চলমান জীবনের অভিজ্ঞতা, সাম্প্রতিক রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের এক সহজ, সরল এবং সুপাঠ্য উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী মুসলমানদের হাজারো রকমের দুর্ভাগ্য এবং বঞ্চনার করুণ চিত্র।

দেশভাগের অভিঘাত বাঙালি জীবনের মতো অন্য কোনও জাতির ক্ষেত্রে এতো বহুমাত্রিক হয়ে দেখা দেয়নি। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে রয়ে যাওয়া মুসলিমরা আক্ষরিক অর্থেই নিঃস্ব অবহেলিত একটা ভিখিরি সমাজে পরিণত হয়েছিল। তুলনামূলক অবস্থাপন্ন ধনিক শ্রেণি, বিশেষত ব্যবসায়ী সমাজ নিরাপত্তার আশঙ্কায় পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেল। শিক্ষিতরা ওপারে চলে গেল ফাঁকা উচ্চপদে চাকরির লোভে। চলে গেলেন বদর উদ্দীন ওমর, হাসান আজিজুল হকের মতো চিন্তাশীল লেখকেরা সহ সওগাত, মোহাম্মদী ও বেগমের মতো পত্রিকা —যাদের ঘিরে শিক্ষিত মুসলিম সমাজে একটা সাংস্কৃতিক বৃত্ত গড়ে উঠেছিল, তারাও তাদের কেন্দ্র স্থানান্তর করে নিয়ে গেলেন ঢাকায়। পড়ে রইল শুধু মইনুল হাসানের ভাষায় 'নাংলা চাষা'রা। কলকাতার উর্দুভাষী মুসলমানরা মেটিয়াবুরুজ, পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার ইত্যাদি নিজস্ব মহল্লা ছেড়ে কিন্তু তেমন ভাবে পাকিস্তানে যায়নি। ফলে বাঙালি মুসলমানের কপালে জুটলো আরেক দুর্ভাগ্য—কলকাতার অমুসলিম নব্য প্রজন্ম মুসলমান বলতে তাদের চারিপাশের অবাঙালি উর্দুভাষীদেরই দেখল। কলকাতার বাইরে মুর্শিদাবাদ মালদা সহ বিভিন্ন জেলায় যে ৯৫ বঙ্গভাষী মুসলিম আছে, সে খবর মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের কাছে একপ্রকার উপেক্ষিতই থেকে গেল। তারই ফল এখনো ভোগ করে যেতে হচ্ছে—আপনাকে মুসলমান বলে মনেই হয় না, কী সুন্দর বাংলা বলেন!

আলোচ্য পুস্তকটি ছয়টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম তিনটি প্রবন্ধে—'বাঙালি ও মুসলমান', 'মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান : আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব', 'নামে-সম্বোধনে হিন্দু-মুসলমান' এবং শেষে 'স্বাধীনোত্তর বাংলায় সংখ্যালঘু উন্নয়ন: একটা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক দেশভাগের পরে পোকায় খাওয়া শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোক বিহীন পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজের দুর্দশার চেহারা এবং কারণগুলি খুব সাবলীল ভাষায় চিত্রায়িত করেছেন। একদিকে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের 'মধ্যবিত্ত সুলভ উন্নাসিকতা' সনাতনী হিন্দুয়ানাকেই বাঙালিয়ানা বলে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। ফলে সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব সংকটের দোলাচলে থাকা মুসলমান ক্রমশ প্রচলিত বাঙালিয়ানা থেকে দূরে সরে গিয়েছে। খুব সূক্ষ্মভাবে এই বাংলায় মুসলিম অস্তিত্বকে উপেক্ষা এবং অস্বীকার করার প্রচেষ্টা সচেতনভাবে

জারি থেকেছে। শেরে বাংলা ফজলুল হকের প্রতিষ্ঠিত দুই কলেজের মধ্যে ইসলামিয়া কলেজের নাম বদলে মৌলানা আজাদ হল (ফজলুল হক হল না), কিন্তু লেডি ব্রেবোর্ন থেকে গেল (সাহেবি নাম তো, থাকতেই পারে)। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে মুসলিম পরব নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন থাকা হয়, মুসলিম লেখকরা প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় স্থান পান না, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতো মানের লেখকেরও আনন্দবাজারে স্থান হয়নি। খুব পরিকল্পিতভাবে করণিক, শিক্ষাকর্মী, কনস্টেবল প্রভৃতি চাকরিতে মুসলিমদের স্থান হয়নি। ডানপন্থী বামপন্থী সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও এই মানসিকতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। লেখক নিজে সুপরিচিত নেতৃস্থানীয় রাজনীতিক। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ তুলে দেখিয়েছেন ঘোষিত এবং নীতিগতভাবে অসাম্প্রদায়িক বামপন্থী দল শাসিত প্রশাসনে মুসলিমরা কীভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। মন্ত্রিসভা কিংবা দলীয় নেতৃত্ব —কোথাও মুসলিমদের প্রাপ্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি।

শুধু মধ্যবিত্ত হিন্দুর পরিকল্পিত উন্নাসিকতাই নয়, এই বাংলার মুসলিম সমাজের নিজেদের ত্রুটি এবং প্রচেষ্টার ঘাটতিগুলিও লেখক স্পষ্ট ভাবেই তুলে ধরেছেন। সুযোগ যেটুকু ছিল, সেটুকুকেও অবহেলা করে এই বাংলার মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। গ্রামগঞ্জের মানুষ ছেলে মেয়েকে সরকারি স্কুলে পাঠানো অপেক্ষা খারিজি মাদ্রাসায় দ্বীনিয়াত শিক্ষার জন্য পাঠাতে বেশি পছন্দ করেছে। বাঙালি হয়ে উঠতে গেলে বড্ড বেশি হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির সাথে আপোষ করতে হয়— ফলে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেকে বাঙালি ভাবা থেকে দীর্ঘকাল তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। তবে গত বিশ-ত্রিশ বছরে আল-আমিন মিশনের মতো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে অল্প হলেও মুসলমান সমাজে একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে — তার স্পষ্ট রূপরেখা অঙ্কন করেছেন লেখক এই পুস্তকে।

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রবন্ধ দুটি — 'সংকটকাল' এবং 'আমার দেশ—আমার স্বপ্ন' আরও গভীর এবং বিস্তৃত পরিসর নিয়ে চিন্তা ভাবনায় সমৃদ্ধ। বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে জাতীয় স্তরে যে অজ্ঞানতার অন্ধকার ক্রমশ আমাদের শিক্ষা, প্রগতি এবং চেতনাকে আচ্ছন্ন করে তুলছে, তার একটা চেহারা তুলে ধরেছেন। বামপন্থার রাজনীতির দুর্বলতাগুলি ঠিক কোথায় —সোভিয়েতের পতন এবং চীনের আধুনিকীকরণের উদাহরণ দিয়ে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বাংলার মুসলমান সমাজের অবস্থান এবং উত্তরণের চিত্র পেতে আগ্রহী পাঠকের তৃষ্ণা অনেকটাই মেটাবে এই গ্রন্থ।

কোন গ্রন্থই সব পাঠকের সব চাহিদা মেটাতে পারে না। ত্রুটি নয়, কিন্তু কিছু অপূর্ণতার কথা এখানে উল্লেখ করি। বর্তমানে বাঙালি মুসলমানের সংকট ও দুরাবস্থার চিত্র লেখক প্রাঞ্জল ভাবেই তুলে ধরেছেন, পিছনের কারণগুলিও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই দুষ্টচক্রের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবার কোনো স্পষ্ট পথনির্দেশিকা লেখক দেননি। বর্তমান শিক্ষিত মুসলমান যুব সমাজের সামনে একটাই তো প্রশ্ন—অতঃপর কী করণীয়?

আরও উল্লেখ্য, 'বাঙালি ও মুসলমান' পুস্তকের যে ফোকাস, আলোচনার অভিমুখ, সেই বৃত্তের মধ্যে চতুর্থ ও পঞ্চম প্রবন্ধ দুটি যেন অনেকটাই বেমানান। নিজ গুণে নিবন্ধ দুটি অবশ্যই উচ্চমানের, কিন্তু এই পুস্তকে তাদের উপস্থিতি ঠিক মানানসই হয়ে ওঠেনি। পরিশেষে সামান্য একটু উল্লেখ, হয়তো ছাপার এদিক ওদিক---আল-আমিন মিশনের সাংগঠনিক প্রাণপুরুষটির নাম নুরুল ইসলাম, ছাপার বিচ্যুতিতে নুরুল হক হয়ে গিয়েছে (১১৬পৃষ্ঠা)। যাইহোক, বোর্ড বাঁধাই পুস্তকটির বর্ণসজ্জা, কাগজ এবং প্রচ্ছদ সবটাই বেশ পরিচ্ছন্ন, রুচিপূর্ণ।

— ইনাস উদ্দীন

বাঙালি ও মুসলমান, মইনুল হাসান, উদার আকাশ প্রকাশনা, ১৫০